ছবি: দেবাশিস দেব

জর্জ ম্যালোরির ক্যামেরা

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

শেরবাহাদুর ছেত্রী যখনই নিজের দেশ নেপাল থেকে ঘুরে আসে, টুবলুদের হাউজিংয়ের সব বাচ্চার জন্য কিছু না-কিছু জিনিস নিয়ে আসে। টুবলু যখন ছোট ছিল, তখন টুবলুর খুব উত্তেজনা হত সেই জিনিসগুলো পেয়ে। জিনিসগুলো হয়তো সামান্য, সস্তার বা কখনও ব্যবহার করা জিনিস, কিন্তু টুবলুর কাছে সেগুলো ছিল অমূল্য। অমূল্য, কারণ, সেসব জিনিস কলকাতায় একটাও পাওয়া যায় না। যেমন, শেরবাহাদুর অনেকদিন আগে টুবলুকে একটা ন্যাড়ামাথা, ভুঁড়িওয়ালা ছোট পুতুল এনে দিয়েছিল। তার ভুঁড়িতে চুলকোলে বৃদ্ধ হি হি করে হাসত আর ভুঁড়িতে চাপ দিলে চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়ত। এই পুতুলটা অনেকদিন টুবলুদের বাড়িতে একটা দর্শনীয় বস্তু ছিল। সকলে জানতে চাইতেন, পুতুলটা কোথা থেকে

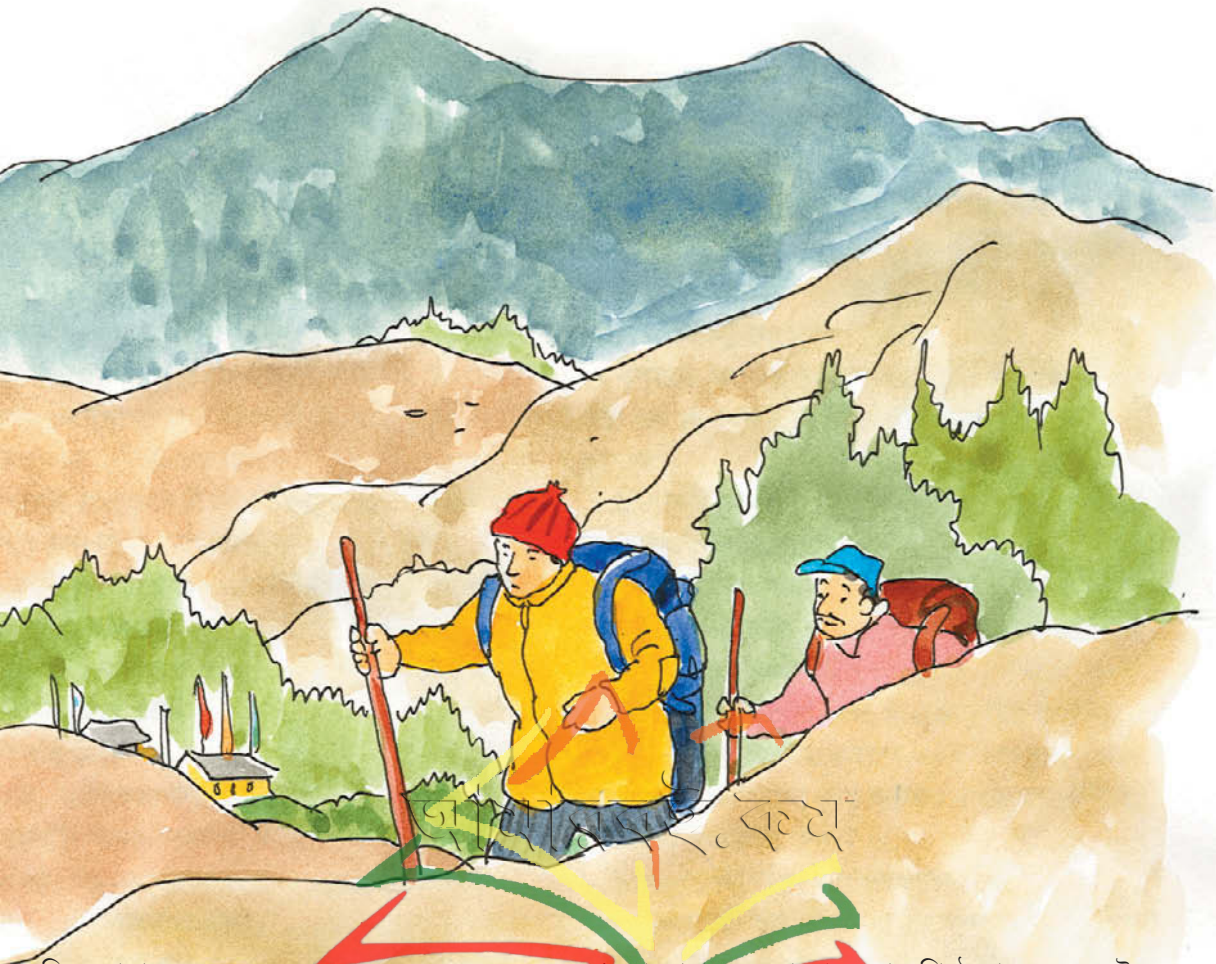

নিয়ে আসা হয়েছে।

শেরবাহাদুর টুবলুদের হাউজিংয়ের দরোয়ান। মাঝবয়সি। ছোটখাটো গাট্টাগোট্টা চেহারা। এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ট্রেকিং করার রাস্তায় সিয়াংবোচে বলে একটা জায়গার পাঁচ কিলোমিটার দূরে প্রত্যন্ত এক গ্রামে তার বাড়ি। তবে শেরবাহাদুর সেটাকে প্রত্যন্ত ভাবতে মোটেই রাজি নয়। কারণ, ওদের গ্রাম থেকেই নাকি এভারেস্টের চূড়ার সবচেয়ে ভাল ভিউ পাওয়া যায়। ট্রেকিং আর পর্বতারোহণের সিজনে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের লোক শেরবাহাদুরদের গ্রামের উপর দিয়ে এভারেস্ট বেস ক্যাম্পের দিকে যায়। শেরবাহাদুরদের গ্রামে অনেকে শেরপাদের কাজ করেন। কয়েকজন আছেন, যাঁরা এভারেস্টের চূড়ায়ও পর্যন্ত উঠেছেন। এঁদের নিয়ে শেরবাহাদুরের খুব গর্ব। যাই হোক, শেরবাহাদুরদের গ্রামে বিদেশি টুরিস্টদের জন্য সামান্য থেকে দামি অনেকরকম জিনিস বাড়িতে-বাড়িতে পাওয়া যায়। নানা জায়গা থেকে ওগুলো সংগ্রহ করে টুরিস্টদের কাছে বিক্রি করে দু' পয়সা উপার্জন করেন গ্রামের মানুষরা। শেরবাহাদুর দেশে গেলে কাছেপিঠে থেকে সেরকমই একটা-আধটা জিনিস নিয়ে আসে টুবলুদের জন্য।

টুবলু অবশ্য এখন যথেষ্ট বড়। এই বছর মাধ্যমিক দিয়েছে। এখন অন্য কারণে শেরবাহাদুরের আনা জিনিসগুলো টুবলুর কাছে অমূল্য মনে হয়। কারণ, শেরবাহাদুরের আনা এই ছোট্টখাট্টো জিনিসগুলোর মধ্যে আছে টুবলুর জন্য শেরবাহাদুরের একবুক ভালবাসা। তবে টুবলুর মতো যারা বড় হয়ে যাচ্ছে, তাদের জন্য এখন শেরবাহাদুরও জিনিস আনার রকমে বদল করেছে। বড়দের জন্য এখন আর পুতুল আনে না। এবার যেমন কয়েক মাস আগে শেরবাহাদুর যে জিনিসটা এনে দিয়েছে টুবলুকে, তেমন জিনিস আগে কোনওদিন আনেনি। জিনিসটা হচ্ছে, একবাক্স পঁয়ত্রিশ মিলিমিটারের স্লাইড।

এই ডিজিটাল ফোটোগ্রাফির যুগে পঁয়ত্রিশ মিলিমিটার স্লাইড বস্তুটা অনেকেই ভুলতে বসেছে। আজকাল ডিজিটাল ফোটো সবাই পটাপট তুলে ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে ডাউনলোড করে নিয়ে প্রিন্ট আউট করে নেয়

বা ডিজিটাল প্রজেক্টরে স্ক্রিনে ফেলে বড় করে দেখে। ডিজিটাল যুগের আগে প্রজেক্টরে বড় করে ছবি দেখার একটাই উপায় ছিল, পঁয়ত্রিশ মিলিমিটারের স্লাইড। স্লাইডগুলো ছোট-ছোট চৌকো কার্ডবোর্ডের মধ্যে আঠা দিয়ে আটকানো থাকত আর ঘর অন্ধকার করে প্রজেক্টরে সেগুলো দেখা হত।

শেরবাহাদুরের ভালবেসে এনে দেওয়া স্লাইডগুলো টুবলু উপেক্ষা করেনি, যত্ন করেই রেখে দিয়েছিল। কিন্তু বাড়িতে কোনও প্রজেক্টর না থাকায় ওগুলো কীভাবে দেখবে, বুঝে উঠতে পারেনি। টুবলুদের বাড়িতে একদিন টুবলুর জেঠতুতো দাদা অর্ণব এসে দেখে ফেলল শেরবাহাদুরের দেওয়া স্লাইডের বাক্সটা। জানলার কাছে এসে রোদে স্লাইডগুলো দেখতে-দেখতে বলল, "ইন্টারেস্টিং! হিমালয়ের ফোটো মনে হচ্ছে। প্রজেক্টরে ছবিগুলো দেখবি?"

"প্রজেক্টর কোথায় পাব?"

অর্ণব কোনও উত্তর না দিয়ে মুখটা লজ্জা-লজ্জা করল। আর তাতেই টুবলু উত্তরটা পেয়ে গেল। এ প্রজেক্টর নিশ্চয়ই আছে অনুজাদিদিদের বাড়িতে। অনুজা অর্থাৎ যার এম কম পরীক্ষার ঝামেলাটা বছরখানেকের মধ্যে মিটে গেলেই অর্ণবের সঙ্গে বিয়ে হবে বলে দু' বাড়ি থেকে ঠিক করা আছে। টুবলুর বাবা সুমিত বাগচীর সঙ্গে অনুজার বাবা অপনেশ চৌধুরীর অনেকদিনের সম্পর্ক। ওঁরাই এই বিয়েটা ঠিক করেছেন।

"ওয়াও দাদাই! কী দারুণ একটা ওবাড়ি যাওয়ার বাহানা পেয়ে গেলে," অর্ণবের পিছনে লাগতে টুবলু বলল। অর্ণব আলতো করে টুবলুর মাথায় একটা গাট্টা মেরে বলল, "ও বাড়িতে গেলে পেটপুজো করার সময় তো নিজে লজ্জা-শরমের কোনও ধার ধারিস না। সিরিয়াসলি শোন। ওদের বাড়িতে প্রজেক্টর আছে। আর কাকু তো পাহাড়-পর্বতের ব্যাপারে একজন অথরিটি। ফোটো দেখতে খুব ভালবাসেন।"

অপনেশ চৌধুরী যে একজন পাহাড়পাগল মানুষ, সেটা টুবলু ছেলেবেলা থেকেই জানে। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর বাড়িতে বসে থাকতে-থাকতে একটা দিন এই উপলক্ষে অনুজাদের বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তাবটা মন্দ লাগল না। বলল, "তা হলে চলো, বাহাদুরচাচার স্লাইডগুলো নিয়ে হয়ে যাক আর একবার পেটপুজো।"

অর্ণবের তর সইল না। স্লাইডগুলোর কথা তৎক্ষণাৎ ফোন করে জানিয়ে দিল হবু শ্বশুরমশাই অপনেশ চৌধুরীকে।

পেশায় হাইকোর্টের নামী উকিল হলেও অপনেশবাবুর নেশা পাহাড়। কম বয়সে বহু ট্রেকিং, মাঝারি মাপের পিক ক্লাইম্বিং করেছেন। তারপর একটু বয়সে ব্লাড প্রেশারের উপসর্গ দেখা দিতে ট্রেকিং, ক্লাইম্বিংটা ডাক্তারের নির্দেশে ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু পাহাড় নিয়ে চর্চা করার আগ্রহটা একইরকম রয়ে গিয়েছে। ওঁর অবসর কাটে ইন্টারনেটে পাহাড়-পর্বত নিয়ে চর্চা করে। হবু জামাই যখন পাহাড়ের ফোটো দেখতে আসতে চাইল, খুব আগ্রহভরে পরের দিনই চলে আসতে বললেন উনি।

পরের দিন সন্ধেবেলায় অর্ণব আর টুবলু এসে হাজির হল অপনেশবাবুদের বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে। দরজায় বেল টিপতেই দরজা খুলে দিল অনুজা। পিছন-পিছন এগিয়ে এলেন অপনেশবাবু। অমায়িক গলায় বলে উঠলেন, "এসো, এসো।"

ভিতরে ঢুকেই লম্বা শ্বাস নিল টুবলু। ফিশ ফ্রাইয়ের হালকা গন্ধে ভরে আছে ড্রইংরুমটা। অপনেশবাবুর স্ত্রী শ্রীময়ীদেবীও এসে খানিক গল্পগুজব করলেন। তারপর অপনেশবাবু এলেন আসল প্রসঙ্গে, "কই, পাহাড়ের কী স্লাইড এনেছ দেখি।"

অপনেশবাবু সব ব্যবস্থা আগের থেকেই করে রেখেছিলেন। একটা সাইড টেবিলের উপর প্রজেক্টরটা রাখা ছিল। টুবলুর হাত থেকে স্লাইডের বাক্সটা নিয়ে সেগুলো প্রজেক্টরের ট্রেতে ভরলেন। অনুজা দেওয়ালের একদিকে একটা সাদা স্ক্রিন টাঙিয়ে আলো নিভিয়ে ঘরটা অন্ধকার করে দিল। প্রজেক্টরের বাতিটা জ্বলে উঠতেই ঝকঝক করে উঠল প্রথম ফোটোটা।

একটা গ্রাম। ফোটোর উজ্জ্বলতা দেখে বোঝা যাচ্ছে বেশ চড়া রোদেই তোলা হয়েছে ফোটোটা। গ্রামটায় ইতস্তত কিছু নীল আর সবুজ রঙের বাড়ি। বাকি আশপাশের জায়গাগুলো পাথুরে। পিছনে পাহাড়। পাহাড়ের চুড়োগুলো বরফে ঢাকা। তার মধ্যে অপনেশবাবু খুঁজে নিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু চুড়োটা। মুগ্ধ গলায় বললেন, "এভারেস্ট! আহা। এ ফোটো তুমি কোথায় পেলে অর্ণব?"

"এটা আসলে টুবলুর কালেকশন। ও এত করে ধরেছিল প্রজেক্টরে দেখবে। আসলে আপনাকে বলতে লজ্জা পাচ্ছিল।"

অন্ধকারে দাঁত কিড়মিড় করে উঠল টুবলু। ও মোটেই ফোটোগুলো প্রজেক্টরে দেখার জন্য আঁকুপাঁকু করেনি। দাদা স্মার্ট সাজছে। আর অপনেশবাবুদের বাড়িতে ছেলেবেলা থেকে যাতায়াত টুবলুর। লজ্জা পাওয়ার প্রশ্নই

নেই।

অপনেশবাবু বললেন, "আরে আমাদের বাড়ি আসবে, তাতে আবার লজ্জা কী! যখন ইচ্ছে হবে চলে আসবে। আর এরকম ফোটো পেলে তো সঙ্গে-সঙ্গে চলে আসবে। হিমালয়ের ফোটো আমি যতই দেখি, ততই উদ্বুদ্ধ হই। মনে হয়, আর একবার ঘুরে আসি হিমালয়ের কোলে। কিন্তু ডাক্তার...," অপনেশবাবু দীর্ঘশ্বাস সামলে বললেন, "কোথায় এ ফোটোগুলো পেলি টুবলু?"

টুবলুকে এবার মুখ খুলতেই হল, "এটা আসলে আমাদের বাড়ির দরোয়ান বাহাদুরচাচা ওর গ্রাম থেকে এনে দিয়েছে। বাড়িতে এমনিই পড়েছিল। দাদাই বলল..."

ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। অর্ণব তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "এই ফোটোগুলো কোথা থেকে তোলা কাকু?"

"এভারেস্টের যে ফেসটা দেখছ, তাতে বোঝা যাচ্ছে, অফ কোর্স নেপালের কোনও জায়গা থেকে তোলা। তা ছাড়া ভাল করে খেয়াল করে দ্যাখো, ফোটোয় একটা সাইনবোর্ডের একটু দেখা যাচ্ছে। ওগুলো নেপালি ভাষায় লেখা। যদিও নেপালি ভাষাটা আমি জানি না। কিন্তু অক্ষরগুলো চিনতে পারি। নীল আর সবুজ রঙের বাড়ির গ্রামটা দেখে জায়গাটার একটা আন্দাজ পাচ্ছি।"

শ্রীময়ীদেবী তাড়া দিলেন, "একটা ফোটোতেই আটকে থেকো না। ওরা তো ফোটো দেখার পর একটু গল্পগুজব করে খাওয়াদাওয়া করবে।"

একে-একে কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ফোটো দেখা হয়ে গেল। সবসুদ্ধ ছত্রিশটা ফোটো। অপনেশবাবু একেবারে মুগ্ধ। সব মিলিয়ে সারমর্ম যা বললেন, তা হল, ফোটোগুলো নেপালে তোলা, যিনি ফোটো তুলেছেন তিনি সম্ভবত ট্রেকার এবং নেপালের নামচেবাজার অঞ্চল দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। অপনেশবাবুর অবশ্য আরও বিশদে জায়গাটা সম্বন্ধে গল্প করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সেটা হল না শ্রীময়ীদেবীর জন্য। উনি চাইছিলেন না যে, ঘর অন্ধকার করে শুধু পাহাড় নিয়ে অপনেশবাবুর বক্তৃতা হোক। সকলে মিলে গল্পগুজব করে ডিনার খাওয়া হোক। অপনেশবাবুর ইচ্ছে ছিল, ফোটোগুলো প্রথম থেকে আর এক রাউন্ড দেখা হোক। অর্ণব দুম করে বলে দিল, "আপনি ইচ্ছে করলে স্লাইডগুলো রেখে দিন না। বাড়িতে তো পড়েই ছিল। ভাল করে দেখে রাখবেন। পরে না হয় আমরা এসে আর একদিন নিয়ে যাব।"

টুবলু মনে-মনে ভাবল, আচ্ছা তো। জিনিসটা টুবলুর। দাদাই একবারও টুবলুকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করল না। আসলে দাদার মতলবটা টুবলু ভালই বোঝে। আর-একবার এই বাহানায় এ বাড়িতে আসার সুযোগ খোঁজা। তবে এবাড়িতে এলে ডিনারটা এত জমিয়ে হয়, টুবলুর তাই স্লাইডগুলো রেখে যাওয়ার আইডিয়াটা খুব একটা মন্দ মনে হল না।

॥ ২ ॥

সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধেবেলায় অপনেশবাবু আর শ্রীময়ীদেবী টুবলুদের বাড়িতে এলেন। সুমিতবাবু দরজা খুলে অমায়িক গলায় বলে উঠলেন, "আসুন-আসুন অপনেশদা, আসুন বউদি।"

টুবলুর মা রিনাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, "এ মা, অনুজাকে নিয়ে এলেন না কেন?"

অপনেশবাবু বললেন, "সব বলছি। আসলে আজ এসেছি টুবলুর কাছে। একটা সাঙ্ঘাতিক জিনিসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সেটা একটা বিরাট রহস্যভেদ করে ফেলতে পারে। ব্যাপারটা ইতিহাস একেবারে অন্যভাবে লিখে দেবে।"

শ্রীময়ীদেবী যেন অল্প লজ্জিত। বললেন, "ওকে তো চেনো সুমিত। আসলে ওর মাথায় কিছু একটা ঢুকলে ওকে আর আটকে রাখা যায় না। টুবলুর সঙ্গে ফোনে কথা বললেই যখন ব্যাপারটা মিটে যেত...।"

"কী বলছ তুমি?" অপনেশবাবু শ্রীময়ীদেবীর মুখের দিকে বড়-বড় চোখ করে তাকিয়ে বললেন, "এত বড় একটা আবিষ্কার। এই আবিষ্কারটা ঠিকঠাক হলে মানুষের পর্বত লঙ্ঘনের ইতিহাস নতুন করে লেখা হবে। এটা ফোনে-ফোনে হয়?"

"কিচ্ছু মনে করার ব্যাপার নেই। আপনারা রিল্যাক্স করে বসুন। রিনা, তুমি আগে একটু কফি বানাও," সুমিতবাবু ওদের সোফায় এনে বসালেন।

টুবলুও গিয়ে সোফায় বসতেই অপনেশবাবু বললেন, "তোকে তোর বাহাদুরচাচা স্লাইডগুলো কবে এনে দিয়েছে টুবলু?"

"এই তো মাসখানেক আগে যখন দেশ থেকে ফিরল। বাহাদুরচাচা যখনই দেশ থেকে ফেরে, তখনই হাউজিংয়ের সব বাচ্চার জন্য কিছু না-কিছু নিয়ে আসে। আমরা সবাই অবশ্য এখন বাচ্চা নই। কিন্তু বাহাদুরচাচা আমাদের বাচ্চাই মনে করে।"

সুমিতবাবু স্লাইডের ব্যাপার কিছুই জানতেন না। টুবলু শেরবাহাদুরের কথা বলতেই সুমিতবাবুও শেরবাহাদুরের

সঙ্গে ওঁদের বাড়ির সম্পর্কটা অপনেশবাবুকে খুলে বললেন। সব শুনে অপনেশবাবু বললেন, “একবার কথা বলা যায় শেরবাহাদুরের সঙ্গে?”

“নিশ্চয়ই যায়। ও তো গেটে ডিউটিতে আছে। ডেকে পাঠাচ্ছি। কিন্তু তার আগে বলুন তো রহস্যটা কী?”

রিনাদেবী গরম কফি নিয়ে এসে সেন্টার টেবিলে রাখলেন। গরম কফিতে চুমুক দিয়ে অপনেশবাবু রহস্যটা কী বলার আগে টুবলুকে একটা প্রশ্ন করে বসলেন, “এভারেস্টের চূড়ায় প্রথম কে উঠেছিলেন, বল তো টুবলু?”

একেবারে জলের মতো সরল কুইজ। টুবলু বলল, “এডমন্ড হিলারি আর তেনজিং নোরগে।”

“আর ইউ শিওর?” প্রশ্নটা করে অপনেশবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে টুবলুর মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন। এত সহজ জানা একটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর শুনেও অপনেশবাবু কেন যে চুপ করে গেলেন, কেউ বুঝতে পারল না। অপনেশবাবুর গম্ভীর মুখ দেখে টুবলু আমতা-আমতা করে বলল, “তাই তো পড়েছি।”

“আমরাও সবাই তাই পড়েছি,” অপনেশবাবু বললেন, “কারণ, এভিডেন্স হিসেবে তাই ডকুমেন্টেড আছে। কিন্তু সত্যি প্রথম কে এভারেস্ট জয় করেছিলেন, তা নিয়ে ইতিহাসে একটা সংশয় আছে। ১৯২৪ সালে এডওয়ার্ড নর্টনের নেতৃত্বে এক ব্রিটিশ অভিযাত্রী দল এভারেস্ট অভিযান করেন। এই অভিযানের সদস্যদের মধ্যে দু’জন ছিলেন জর্জ লে ম্যালোরি আর অ্যান্ড্রু আরভিন। অভিযানের বিশদে যাচ্ছি না। কিন্তু একটা জোরালো সম্ভাবনা আছে যে, ১৯২৪ সালের ৮ জুন ম্যালোরি আর আরভিন পৃথিবীর প্রথম মানুষ হিসেবে এভারেস্টে উঠেছিলেন।”

“মানে?” ঘটনাটা সকলের মনে আগ্রহের সৃষ্টি করল।

“এভারেস্টের চূড়ার ফোটোটা মনে করে দ্যাখ। কীরকম? অনেকটা পিরামিডের মতো। যেদিন ম্যালোরির আর আরভিনের এভারেস্ট শৃঙ্গে ওঠার কথা ছিল, সেদিন ওই অভিযানের আর-এক সদস্য নোয়েল ওডেল অনেক দূরে নিজের ক্যাম্প থেকে দূরবিন দিয়ে এই পিরামিডের পাদদেশে দু’টো ক্ষুদ্র মানুষকে খুব ধীরে-ধীরে শীর্ষ চূড়ার দিকে উঠতে দেখেছিলেন। মানে আর কিছুটা উঠলেই পৃথিবীর প্রথম মানুষ হিসেবে তাঁদের শীর্ষজয় সম্পূর্ণ হয়ে যেত। এমন সময় ঘন মেঘ এসে ঢেকে দিয়েছিল সব কিছু। মেঘ যখন কেটে গেল তখন ওডেল আর ওঁদের দেখতে পাননি। যেহেতু ওই উচ্চতায় অন্য কোনও মানুষ থাকার সম্ভাবনা ছিল না, তাই সন্দেহ ছিল না ওই দু’জন ছিলেন ম্যালোরি আর আরভিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা শীর্ষে উঠতে পেরেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে আর কোনও প্রমাণ নেই। কারণ, এর পরেই ম্যালোরি আর আরভিন নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। ওঁরা যে দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন সে ব্যাপারে সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রশ্ন ছিল শুধু একটাই, শীর্ষ জয়ের আগে না পরে ওঁরা দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন। যদি শীর্ষ জয়ের পরে ওঁরা দুর্ঘটনায় পড়ে মারা গিয়ে থাকেন, তা হলে নিঃসন্দেহে এভারেস্টকে ওঁরাই প্রথম জয় করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সত্যিই পেরেছিলেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর কেবল একটা জিনিসই দিতে পারত। জর্জ ম্যালোরির ক্যামেরা।”

একটু দম নিয়ে অপনেশবাবু আবার শুরু করলেন, “খুব ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, অনেকদিন পরে ম্যালোরির মৃতদেহকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।”

“কবে?” সমস্বরে সকলে বলে উঠল।

অপনেশবাবুর গলাটা আরও গম্ভীর হল, “পঁচাত্তর বছর পরে। ১৯৯৯ সালে ম্যালোরি আর আরভিনের মৃতদেহ খুঁজে বের করার এক বিশেষ অভিযান হয়। কষ্টসাধ্য সেই অভিযানে অবিশ্বাস্য ভাবে ম্যালোরির বডিটা খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। বরফের মধ্যে ছিল বলে বডিটা অতদিন ছিল। অবশ্য আরভিনের বডিটা খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে ম্যালোরির বডির সঙ্গে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল ওঁর টুকিটাকি অনেক জিনিস। ম্যালোরির পকেটে ওয়ালেট, কাগজপত্তর, ছুরি, সানগ্লাস, সেফটিপিন, ঘড়ি, এমনকী, আইস এক্সটাও। শুধু খুঁজে পাওয়া যায়নি ম্যালোরির ক্যামেরাটা।”

অপনেশবাবুর দীর্ঘ গল্পটা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলেন। কিন্তু কেউই বুঝতে পারছিলেন না। অপনেশবাবু এরকম উত্তেজিত হয়ে এই গল্পটা বলতে কেন এসেছেন। কফিটা শেষ করে অপনেশবাবু বাকিটা বলতে শুরু করলেন, “যদি ম্যালোরির ক্যামেরাটা পাওয়া যেত, তা হলে নিঃসন্দেহ হয়ে বলা যেত ম্যালোরি আর আরভিন পৃথিবীর প্রথম মানুষ হিসেবে ১৯২৪ সালের ৮ জুন এভারেস্ট জয় করেছিলেন কি না। কারণ শীর্ষে উঠলে ওঁরা নিশ্চয়ই ক্যামেরায় সেই ফোটো তুলে রাখতেন। নানা ভাবে খোঁজা হয়েছে ক্যামেরাটার, কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। আজ আমি টুবলুর স্লাইডগুলো দেখতে-দেখতে চমকে উঠেছি, সেই ক্যামেরাটা খুঁজে পাওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখে।”

এবার বাকিদেরও চমকে ওঠার পালা। কী এমন সূত্র থাকতে পারে শেরবাহাদুরের এনে দেওয়া স্লাইডে, যাতে এই যুগান্তকারী গভীর রহস্য ভেদ হতে পারে? অল্প দম নিয়ে সেটা বলতে আরম্ভ করলেন অপনেশবাবু।

"টুবলু স্লাইডগুলো রেখে যাওয়াতে, পরের দিন আমি ওগুলো খুব খুঁটিয়ে দেখছিলাম। প্রজেক্টরে আবার ফোটোগুলো দেখতে-দেখতে এভারেস্ট ছাড়া বাকি পিকগুলো ঠিক কী ছিল, বোঝার চেষ্টা করছিলাম। একটু মন দিয়ে দেখেই দু'টো পিক চিনতে পারলাম। কাংটেগা আর কুম্ভিলা। আর তাতেই জায়গাটা নিশ্চিত করে চিনে নিতে পারলাম, ফোটোগুলো তোলা হয়েছে নামচেবাজারের আশপাশে। ছত্রিশটার মধ্যে বত্রিশটা স্লাইডই তোলা হয়েছে নামচেবাজারে। রঙিন গ্রামটা, তার চারদিকের প্রকৃতির সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকটা স্লাইডে ইন্ডোর কিছু ফোটোও আছে। তার মধ্যে একটা স্থানীয় দোকানের ভিতরের ফোটোও আছে। সেই ফোটোটায় দোকানে দেখলাম গাদা করে জিনিস রাখা আছে। তার মধ্যে উঁকি মারছে একেবারে পুরনো মডেলের একটা কোডাক ক্যামেরা। ক্যামেরাটা দেখার পর থেকে আমার মনে একটা খচখচ করছিল। তাই আমি দোকানের ভিতরের ফোটো থেকে মোবাইল ফোনে জুম করে ক্যামেরার ফোটোটা তুলেছি। এই দ্যাখো।"

অপনেশবাবু নিজের মোবাইল ফোনটা সুমিতবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন। সবার হাতে-হাতে ঘুরল ফোনটা। সবাই দেখল ফোনের স্ক্রিনে ফুটে রয়েছে একটা প্রাচীন মডেলের কোডাক ক্যামেরার ফোটো। বেলো করে লেন্সটার ভাঁজ খোলা আছে।

"ইয়েস," রুদ্ধশ্বাসে অপনেশবাবু বললেন, "ম্যালোরির ক্যামেরাটাও ছিল কোডাক, এই মডেলটাই। মডেলটার নাম ভেস্টপকেট।"

"কিন্তু ভেস্টপকেট ক্যামেরা কি ওই একটাই ছিল?" সুমিতবাবু সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

"তা হয়তো ছিল না। কিন্তু ১৯২৪ সালে আজকের মতো বাড়িতে-বাড়িতে দু'-তিনটে করে ক্যামেরা থাকত না। ভেস্টপকেটটাও ছিল লিমিটেড এডিশন। আর নামচেবাজারেও তখন দলে-দলে পর্যটক যেত না। এই পয়েন্টগুলোকে সাজালে একেবারে প্রায় নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, নামচেবাজারে ১৯২৪ সালের কোডাকের ভেস্টপকেট মডেলের কোনও ক্যামেরা থেকে থাকলে সেটা হতভাগ্য জর্জ ম্যালোরিরই ক্যামেরা।"

এসব ঘটনা তর্ক ছাড়া জমে না। তা ছাড়া অপনেশবাবু আর সুমিতবাবু দু'জনেই পেশায় উকিল। সুমিতবাবু ওকালতি তর্ক শুরু করলেন, "যদি কিছু না মনে করেন, স্বাভাবিক বুদ্ধিতে আমার মাথায় কয়েকটা প্রশ্ন আসছে। যেহেতু নামচেবাজার এভারেস্টপ্রেমীদের একটা গন্তব্যস্থান, তাই আশা করা যায় ওখানে বহু মানুষ যান যাঁরা ম্যালোরির ক্যামেরার ব্যাপারটা জানেন। তাঁদের কি কারও চোখে পড়ল না ক্যামেরাটা? আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা মনে আসছে, এই স্লাইডগুলো কবে তোলা? মানে বলতে চাইছি, সেই দোকানে এখনও ক্যামেরাটা থাকার কি কোনও সম্ভাবনা আছে?"

অপনেশবাবু নড়েচড়ে বসলেন, "এগজাক্টলি! আমার মনেও এই প্রশ্ন দু'টো সকলের আগে এসেছিল, সেই সঙ্গে আরও কয়েকটা জরুরি প্রশ্ন। রিনা তোমাকে আর একবার বিরক্ত করব? আর এক রাউন্ড যদি কফি পাওয়া যায়।"

রিনাদেবী বলে উঠলেন, "নিশ্চয়ই। কিন্তু ব্যাপারটা এত ইন্টারেস্টিং, আমি কফি নিয়ে এলে তারপর আপনি বাকিটা বলবেন।"

রিনাদেবী কিচেনের দিকে চলে যাওয়ার পর অপনেশবাবু বললেন, "এই ফাঁকে কি শেরবাহাদুরকে একবার ডেকে নেওয়া যায়?"

"এক্ষুনি ডাকছি," সুমিতবাবুর মোবাইলেই ছিল শেরবাহাদুরের নম্বর। শেরবাহাদুরকে ওঁর ফ্ল্যাটে এসে দেখা করতে বললেন। দু' মিনিটের মধ্যে শেরবাহাদুর চলে আসার পর সময় নষ্ট না করে অপনেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুম ছোটেবাবুকো যো স্লাইড লা দিয়ে থা, ও কাঁহাসে খরিদা থা?"

অপনেশবাবুর বাঙালি হিন্দি শুনে টুবলুর পেট গুলিয়ে হাসি পেয়ে গেল। শেরবাহাদুর বহুদিন কলকাতায় আছে। ঝরঝরে বাংলায় কথা বলতে পারে। তা ছাড়া ওর মাতৃভাষা হিন্দি নয়, নেপালি। তবে অপনেশবাবুর সিরিয়াস মুখ দেখে টুবলু অতি কষ্টে হাসি চাপল। কিন্তু এত রাতে এরকম একটা বেমক্কা প্রশ্ন শুনে শেরবাহাদুর গেল ঘাবড়ে। ঠিক কী জানতে চাইছেন অপনেশবাবু, বুঝতে পারল না। ব্যাপারটা সুমিতবাবুই বুঝিয়ে বললেন। সব শুনে শেরবাহাদুর বলল, "সাহেব, ফোটোগুলো নামচেবাজারে আমার এক গ্রামের ছেলের দোকান থেকে কিনেছি। দোকানটা ও নতুন করেছে।"

এইটুকু শুনেই অপনেশবাবু খুব উৎসাহিত হয়ে পড়ে

বললেন, “দোকানের ফোটোটা তা হলে তোমার বন্ধুর দোকানের নয়। নামচেরই অন্য কোনও দোকান। কিন্তু তা হলেও অঙ্কটা একেবারে মিলে যাচ্ছে!”

রিনাদেবী ততক্ষণে ট্রে-ভর্তি কফির মগ নিয়ে চলে এসেছেন। সেন্টার টেবিলে কফির মগগুলো নামিয়ে রিনাদেবী সকলের হাতে-হাতে ধরিয়ে দিতে-দিতে উৎসুক গলায় বললেন, “এবার শুনি, কী অঙ্ক মিলে যাচ্ছে?”

অপনেশবাবু কফির মগ হাতে তুলে নিয়ে বললেন, “এভারেস্ট অভিযানের সময় কোনও একজন শেরপা বা মোটবাহক ক্যামেরাটা খুঁজে পেয়ে থাকবে। দু’ পয়সা উপার্জনের জন্য নামচেতে এসে কোনও দোকানে এটা বিক্রি করে দিয়েছিল। আর এমনই ভাগ্য, লোকের চোখ এড়িয়ে এটা দোকানেই পড়েছিল। দাঁড়াও, আমার একটা দল আছে। আমি এবার খুঁজে বার করার চেষ্টা করি নামচেবাজারে ক্যামেরাটা এখনও আছে কি না।”

॥ ৩ ॥

এর দিন দুয়েক পরে ঠিক রাত সাড়ে এগারোটার সময় টুবলুদের ফ্ল্যাটের বেল বেজে উঠল। টুবলুই উঠে গেল দরজাটা খুলতে। কিন্তু সিকিওরিটি হোল দিয়ে বাইরেটা দেখে রীতিমতো চমকে উঠল। দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন অপনেশবাবু আর অনুজা। পিছনে শেরবাহাদুর। অপনেশবাবুর মুখটা রীতিমতো উত্তেজিত মনে হল। টুবলু ভেবে পেল না, অপনেশবাবু এত রাতে ফোন না করে অনুজাদিদিকে সঙ্গে করে নিয়ে কেন এরকম উত্তেজিত ভাবে চলে এসেছেন। ততক্ষণে সুমিতবাবু আর রিনাদেবীও উঠে এসেছেন। এত রাতে অপনেশবাবু আর অনুজাকে দেখে ওঁরাও রীতিমতো বিস্মিত। সুমিতবাবু বিস্ময়টা তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলে বললেন, “আসুন-আসুন অপনেশদা।”

রিনাদেবী অবশ্য বলেই ফেললেন, “সব ঠিক আছে তো অপনেশদা? কোনও বিপদ-আপদ হয়নি তো অনুজা? এসো-এসো, ভিতরে এসো।”

অপনেশবাবু বললেন, “শেরবাহাদুরকে একেবারে গেট থেকে পাকড়াও করে নিয়ে এলাম।”

“বেশ করেছেন। তুমিও ভিতরে এসো শেরবাহাদুর।”

অনুজা বলল, “সরি কাকিমা। এত রাত্রে এসে ডিসটার্ব করছি। আসলে বাবাকে কিছুতেই আটকে রাখা গেল না। মা তো বাবার সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছেন, বাবা এত রাতে আপনাদের বাড়ি আসছেন দেখে।”

সুমিতবাবু অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেন, “এটা কোনও কথা হল! বলুন অপনেশদা, কী ব্যাপার?”

অপনেশবাবু নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে বললেন, “সেদিন তোমাদের বলেছিলাম, মনে আছে যে, আমার একটা দল আছে যাদের সাহায্যে আমি ম্যালোরির ক্যামেরাটা খুঁজে পাওয়ার একটা চেষ্টা করব। আগে তোমাকে এই দলটার ব্যাপারে বলি। তোমরা তো জানো, এককালে আমি পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রচুর ঘুরেছি। তারপর ডাক্তার যখন বারণ করে দিল, তখন আমার পাহাড় দর্শনের একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়াল ইন্টারনেট। ইন্টারনেটে ফোটো দেখতাম, নানান অভিযাত্রীর অভিজ্ঞতার কথা, ট্রাভেলগ পড়তাম। এভাবে আমি একদিন সন্ধান পাই একটা ব্লগের। ‘সেভ দ্য মাউন্টেন্স ফ্রম ম্যানকাইন্ড’। অর্থাৎ মানবসভ্যতা থেকে পাহাড় বাঁচাও। আজ থেকে বছর চারেক আগে ব্লগটার পত্তন করেছিলেন আলেকজান্ডার ক্যাম্পবেল বলে একজন ব্রিটিশ পর্বতারোহী। উনি নিজে এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছিলেন। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা থেকে উনি দেখেছিলেন, এভারেস্টের শীর্ষারোহণ করতে গিয়ে অভিযাত্রীরা অনেক দূষণ করছেন। দেশে ফিরে এসে উনি নিজের এই ওয়েবসাইট আর এই ব্লগটা খোলেন। ওখানে বিভিন্ন লোককে ব্লগ মেম্বার হতে আহ্বান করেছেন উনি। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যা হয়, খুব বেশি সাড়া পাননি। সাকুল্যে বারো-চোদ্দোজন মেম্বার। তবে উৎসাহের কথা এটাই যে, এই মেম্বাররা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের। আর আলেকজান্ডারের উদ্দেশ্যটাও ছিল খুব সৎ। পর্বতারোহীদের দূষণ আটকানোর জন্যই নানা চিন্তাভাবনার কথা বলেছেন আলেকজান্ডার। তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন ট্রেকিংয়ের পথে চেকপোস্টের। যেখানে তল্লাশি চালিয়ে দেখা হবে পরিবেশ দূষণ করে এমন জিনিস, যেমন প্লাস্টিক, ক্যান এসব ট্রেকার্সরা সঙ্গে বহন করছে কি না চেক করে দেখা ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো শুধু বন্ধ করে দিলেই তো হবে না, তা হলে ট্রেকার্সরা নেবে কী? সেই বিকল্পের কথাও আলেকজান্ডার বলেছেন। যেমন, জুটের ব্যাগ ইত্যাদি ব্যবহার করতে।

“এর পর যতদিন এগিয়েছে, সংখ্যায় খুব অল্প হলেও ধীরে-ধীরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে একজন-আধজন করে ব্লগের মেম্বার হয়েছেন। তাঁরাও নিজের-নিজের দেশের পাহাড়ি পথের পরিবেশ বিপন্নতার কথা লিখেছেন, যেমন আল্পসের কথা, কিলিমাঞ্জারোর কথা,

ফুজির কথা। দু'জন উত্তর ভারতীয় মেম্বারও আছেন। তারা গাড়োয়াল, কুমায়ুনের বহু ট্রেকিং পথের বিপন্নতার কথা লিখেছেন। আমিও পুরুলিয়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের একইরকম দূষণের কথা লিখে মেম্বার হয়ে যাই। আমার আরও নানা অভিজ্ঞতার কথা লিখি। এতদিন পর্যন্ত ব্যাপারটা একেবারে ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য দিকে মোড় নিল পরশু রাতে। আমি ম্যালোরির ক্যামেরাটা নামচেবাজারে থাকার সম্ভাবনার কথা লেখা আর ক্যামেরার ফোটোটা আপলোড করার পরই। আলেকজান্ডার ব্লগে আমাকে অনেক প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন। কিন্তু আমি তো পেশায় উকিল। কে, কোন অভিসন্ধি নিয়ে প্রশ্ন করছে, বুঝতে পারি। এখন বুঝতে পারছি, আলেকজান্ডার নামচেবাজারে ম্যালোরির ক্যামেরাটা থাকার সম্ভাবনা নিয়ে নিশ্চিত হতে চাইছেন আর তারপর ওঁর দলবল নিয়ে নামচেবাজারে গিয়ে ক্যামেরাটা হাতাতে চাইছেন।"

"দলবল মানে কারা?" খুব চিন্তিত মুখে সুমিতবাবু বললেন।

"ব্লগের অন্য সদস্যরা। দাঁড়াও, ওঁদের নামগুলো তোমাদের বলছি," পকেট থেকে একটা চিরকুট বের করে অপনেশবাবু পড়তে থাকলেন, "আমেরিকার চার্লি আর হ্যারি, সুইজারল্যান্ডের অস্কার, সাউথ আফ্রিকার ওয়াটসন, আয়ারল্যান্ডের ড্যানিয়েল, জাপানের হিতাচি।" একটু থেমে অপনেশবাবু বললেন, "আর ওই যে বললাম, আমি ছাড়া দু'জন ভারতীয় ছেলেও আছে। ওরা হল দুই যমজ ভাই, উত্তরাখণ্ডের উমেশ আর রমেশ।"

রিনাদেবী বললেন, "একেবারে পৃথিবীর সব প্রান্তের রিপ্রেজেন্টেশন আছে দেখছি।"

"আছেই তো। আমি যেমন পুরুলিয়া, দার্জিলিং, গ্যাংটকের কথা বলি, রমেশ-উমেশ যেমন গাড়োয়াল, কুমায়ুনের বহু ট্রেকিংপথের বিপন্নতার কথা বলে, অস্কার সেরকম আল্পসের কথা বলে, হিতাচি ফুজির কথা বলে, ওয়াটসন মাউন্ট কিলিমাঞ্জারোর একই বিপন্নতার কথা বলে। এর সঙ্গে অবশ্য দূষণ আটকাতে কোথায় কী করা যায়, তার পরামর্শও দেন।"

টুবলু কড় গুনছিল। আলেকজান্ডার থেকে অপনেশবাবু সবসুদ্ধ দশজন। সেটা বলতেই অপনেশবাবু বললেন, "না, আর একজন আছেন। রাশিয়ার ইয়েলেতসিন। আমাকে নিয়ে সবসুদ্ধ এগারোজন। ইন ফ্যাক্ট মেম্বারশিপের দিক থেকে আমিই কনিষ্ঠতম মেম্বার।"

সুমিতবাবু নিজের ওকালতি সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন, "আচ্ছা অপনেশদা, ইন্টারনেটে ব্লগে অনেকে

নিজের নকল পরিচয় দেন। এঁরা সত্যিই এই সব দেশের তো?”

“তোমার মতো আমিও হাইকোর্টের উকিল। আমারও সন্দেহ হয়েছিল। সন্দেহ হয়েছিল আরও এই কারণে যে, আলেকজান্ডার অদ্ভুত একটা নিয়ম রেখেছেন এই ব্লগে। কেউ কারও ফোটো ব্লগে রাখতে পারবেন না। কারণ, আলেকজান্ডারের মতে, মানুষ প্রকৃতির চেয়ে বড় নন। এই ব্লগ শুধু প্রকৃতির। তবে নিজেদের পরিচয় সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখতে আলেকজান্ডার আর একটা নিয়ম চালু রেখেছেন। পাহাড় সম্পর্কে ভাল বই পেলে মেম্বাররা নিজেদের মধ্যে সেগুলো চালাচালি করেন। আমি এরকম প্রচুর বই পেয়েছি। ডাকটিকিট আর পোস্ট অফিসের ছাপ দেখে মেম্বারদের নিজের-নিজের দেশের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েছি। আমিও ওঁদের ঠিকানায় বই পাঠিয়েছি।”

অনুজা বলল, “বাবা, অনেক রাত হয়েছে। তুমি আসল ব্যাপারটা বলো।”

অপনেশবাবু নড়েচড়ে বসলেন, “আসল ব্যাপারটা হল ওই যে বললাম, ম্যালোরির ক্যামেরাটার কথা লেখার পর আলেকজান্ডার ব্লগে আমাকে নানান জিজ্ঞাসা শুরু করলেন। অস্কার, চার্লি আর হ্যারি তো সরাসরি ঘোর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। শুধু ওঁরা কেন, একমাত্র ড্যানিয়েল, হিতাচি আর ইয়েলেতসিন ছাড়া সবাই মোদ্দা কথায় আমাকে অবিশ্বাস করেছেন। কিন্তু তার চেয়েও যেটা মারাত্মক, সেটা আলেকজান্ডার আমাকে একটু আগে লিখেছেন, যদি ক্যামেরাটা সত্যি নামচেবাজার অঞ্চলে থেকে থাকে, তা হলে উনি সেটা খুঁজে বের করতে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে আমি যেন আর কাউকে কিছু না বলি। ওটা জানার পর থেকেই একটুও সময় নষ্ট না করে এখানে এত রাতে ছুটে এলাম।”

রিনাদেবী বললেন, “তা হলে তো ভালই হল। ক্যামেরাটা খুঁজে বের করতে পারলে দুর্দান্ত একটা ব্যাপার হবে।”

“ঠিক তাই। তবে ব্যাপারটা অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। আমি সঙ্গে-সঙ্গে আলেকজান্ডারকে লিখেছিলাম, খুব ভাল কথা। এটা খুঁজতে আমিও সঙ্গে থাকতে চাই। উত্তরে আলেকজান্ডার তৎক্ষণাৎ লিখেছেন, আমার যাওয়ার কোনও দরকার নেই। যে ঠিকানায় বই পাঠাই, সেই ঠিকানায় কুরিয়ার করে স্লাইডগুলো ওকে পাঠিয়ে দিলেই হবে এবং তার জন্য আমাকে অবিশ্বাস্য অঙ্কের টাকা অফার করেছেন। আমার ওকালতি বুদ্ধি এটায় একটা গভীর সন্দেহের উদ্রেক করেছে। আলেকজান্ডারের অন্য কোনও গভীর উদ্দেশ্য আছে।”

“একা কৃতিত্বের ভাগীদার হতে চায়?”

“সত্যের খাতিরে সেটা হলেও আমার কোনও আপত্তি ছিল না। আমার মনে হয়, মানুষটাকে আমি এতদিন ভুল চিনেছিলাম। ক্যামেরাটা পাওয়া গেলে পৃথিবীর প্রথম মানুষ হিসেবে ম্যালোরি এভারেস্টে উঠতে পেরেছিলেন কি না, এই সত্যিটা প্রকাশের চেয়ে আলেকজান্ডারের যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এটা নিয়ে ব্যবসা করবেন, তা হলে সত্যিটা প্রকাশ না-ও করতে পারেন।”

“কীরকম?”

“পৃথিবীতে অনেক ধনকুবের প্রাইভেট কালেক্টর আছে, যারা নিজের প্রাইভেট কালেকশনের জন্য ক্যামেরাবন্দি রহস্যটাকেই বহু টাকায় কিনতে চাইবে। রহস্যটাকে কোনওদিন প্রকাশ করবে না। আজ কফি পাব না রিনা?”

রিনাদেবী এত মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন যে, অতিথিদের জন্য কফির কথা একদম খেয়াল করেননি। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন কফি করে নিয়ে আসার জন্য। সুমিতবাবু বললেন, “বুঝলাম, আলেকজান্ডার লোকটা তা হলে আসলে এক নম্বরের ধান্দাবাজ। মুখে ওই সব পরিবেশ রক্ষার কথা বললেও আসল উদ্দেশ্য অন্য।”

অপনেশবাবু গম্ভীর মুখ করে বললেন, “আফশোস একটাই। আমিও আলেকজান্ডার ক্যাম্পবেল লোকটাকে এতদিনে চিনতে পারিনি। অকপটে ক্যামেরাটার কথা আর স্ক্রিন থেকে মোবাইলে ক্যামেরার তোলা ফোটোটা আপলোড করে দিয়েছি। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, আলেকজান্ডার ক্যামেরাটার খোঁজ করতে নেপালের দিকে কয়েকদিনের মধ্যেই চলে আসবেন। সঙ্গে হয়তো চার্লি, হ্যারি, অস্কার, এমনকী উমেশ, রমেশকেও সঙ্গে রাখবেন।”

“এতজনকে? কারণ?”

“কারণ, আলেকজান্ডারের বয়স হয়েছে। এই সব মিশন একা করা সম্ভব নয়। এর আগে কয়েকটা ছোটখাটো মিশনে উনি এঁদেরকেই সঙ্গে রেখেছিলেন। তা ছাড়া আলেকজান্ডার পয়সাওয়ালা লোক বলেই মনে হয়। এভারেস্ট অভিযান খুবই খরচসাপেক্ষ ব্যাপার। সেটা উনি নিজের পয়সায় করেছিলেন। অন্যান্য মিশনে যাঁদের নিয়ে যান, তাঁদের খরচখরচা উনিই দেন। স্বভাবত

উমেশ, রমেশ, হ্যারি, চার্লিরা ওঁর বশংবদ।”

রিনাদেবী কফি নিয়ে এলেন। শেরবাহাদুর এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। রিনাদেবী কফির মগ ওর দিকে এগোতে খুব কুণ্ঠিত হয়ে ‘না’ বলল। রিনাদেবী ওর হাতে জোর করে কফির একটা মগ ধরিয়ে দিলেন। কফির মগে চুমুক দিয়ে অপনেশবাবু বললেন, “সুমিত, মনে আছে, সেদিন তুমি আমাকে দু’টো প্রশ্ন করেছিলে। এক, এতদিনেও কারও চোখে পড়ল না কেন ক্যামেরাটা? আর দুই, সেই দোকানে কি এখনও ক্যামেরাটা থাকার কোনও সম্ভাবনা আছে? প্রশ্ন কিন্তু আরও অনেক আছে।

“প্রথম প্রশ্ন, স্লাইডগুলো কবে তোলা? সেটার উত্তরও একটা স্লাইডে পেয়ে গিয়েছি। আমি দোকানের ভিতরের স্লাইডটার আনাচকানাচ জুম করে দেখেছি। সেখানে একটা ক্যালেন্ডারের পাতা দেখেছি ২০০৪ সালের অগস্ট মাস। মনে রাখতে হবে, অগস্ট মাসটা কিন্তু বর্ষার সময়। তখন হিমালয়ে পর্বতারোহীদের সিজন নয়। সুতরাং সেই সময় ক্যামেরাটা দোকানে পড়ে থাকলে বিদেশি পর্বতারোহীদের চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম। এর সঙ্গে যে প্রশ্নটা আসে, স্লাইডগুলো নামচেবাজারে এল কীভাবে? প্রথমেই মনে হবে, এগুলো কোনও পর্বতারোহীর তোলা। সেক্ষেত্রে সে ফোটো তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের দেশে চলে যাবে। সেখানে ডেভেলপ করাবে। নামচেবাজারে স্লাইডগুলো ফিরে আসার আর কোনও চান্স নেই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, যে স্লাইডগুলো তুলেছিল, সে সম্ভবত স্থানীয় কোনও ফোটোগ্রাফার। হিমালয়ের আর নামচেবাজারের ফোটো তুলে টুরিস্টদের কাছে বিক্রি করার জন্য স্লাইডগুলো তুলেছিল। এখন ডিজিটাল ফোটোর যুগ শুরু হওয়ায় স্লাইডে ফোটো তোলা প্রায় উঠেই গিয়েছে। তাই হয়তো এই স্লাইডগুলো বিক্রি না হয়ে পড়েছিল।”

শেরবাহাদুর অপনেশবাবুকে সমর্থন করে বলে উঠল, “ঠিক বলেছেন বড়সাহেব। এখন সব সিডিতে, চিপে ফোটো বিক্রি হয়। এগুলো এমনিই বিক্রি না হয়ে পড়েছিল। আমি ভেবেছিলাম টুবলুর মজা লাগবে, তাই কিছু না ভেবেই কিনে এনেছিলাম।”

“তুমি যে কী অমূল্য জিনিসের ফোটো নিয়ে এসেছ তুমি নিজেই জানো না শেরবাহাদুর।”

সুমিতবাবু বলে উঠলেন, “কিন্তু আর একটা প্রশ্নের উত্তর? ২০০৪ সালের অগস্ট মাসের পরও নামচেবাজারের কোনও দোকানে যদি ম্যালোরির ক্যামেরাটা ডিসপ্লেতে থেকে থাকে, কোনও মাউন্টেনিয়ারের এটা চোখে পড়ল না?”

অপনেশবাবু গম্ভীর হলেন, “এটাও আমি ভেবেছি। দু’টো কারণ হতে পারে। এক, হয় জাঙ্ক হিসেবে ক্যামেরাটা দোকানে ছিল। দোকানদার নিজেও জানত না, কী অমূল্য জিনিস ওর কাছে রয়েছে। আর দুই, ক্যামেরাটা হয়তো এতদিনে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। তবে দু’ নম্বরটা মনে হয় হয়নি। কারণ, তা হলে পৃথিবীর সব খবরের কাগজে এটা বেরিয়ে যেত। আলেকজান্ডারও নিশ্চয়ই একই বিশ্বাস করে নেপালে অনতিবিলম্বে আসছেন, আর আমিও তাই তড়িঘড়ি এত রাতে তোমাদের বিরক্ত করতে এলাম। আমি খুব আশাবাদী সুমিত। যদি মৃত্যুর পঁচাত্তর বছর পর ম্যালোরির মৃতদেহটা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, ক্যামেরাটাও ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে। আলেকজান্ডার পৌঁছে যাওয়ার আগে আমি শেরবাহাদুরকে নিয়ে একবার যত শিগগিরই সম্ভব নামচেবাজারে যেতে চাই। ওকে কয়েকদিনের ছুটি দিতে পারবে সুমিত?”

সুমিতবাবু বললেন, “শেরবাহাদুরের ছুটি তো আমাদের হাউজিংয়ের সেক্রেটারি ঠিক করেন, তবে মনে হয় না কোনও অসুবিধে হবে। আমি কালই বলব।”

অপনেশবাবু খুশি হয়ে বললেন, “থ্যাঙ্ক ইউ। তা হলে তিনজনের নামচে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি।”

“তিনজন কে-কে?” রিনাদেবী জিজ্ঞেস করলেন।

“আমি, শেরবাহাদুর, আর যাকে সঙ্গে রাখার শর্তসাপেক্ষে তোমার বউদি আমাকে এবারের মতো যাওয়ার পারমিশন দিয়েছে, এই আমার কন্যা। ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।”

অনুজা বলল, “দেখেছ কাকিমা, বাবার পাগলামি। এমনিতে বাবার কিন্তু পাহাড়ে যাওয়া একদম ডাক্তারের বারণ আছে। কিন্তু মা’কে এমন বুঝিয়েছেন এই ঘটনাটার গুরুত্ব।”

“সাঙ্ঘাতিক গুরুত্ব। বুঝতেই পারছ, এতটাই গুরুত্ব যে আলেকজান্ডারের মতলবটা অনুধাবন করার পর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে এত রাতে তোমাদের বাড়িতে চলে এসেছি। ব্যস, লাস্ট এই একবারের জন্য হলেও আমি নামচেবাজার যাবই।”

হঠাৎ করে মাঝরাতে দেশে যাওয়ার এরকম একটা সুযোগ এসে যাওয়ায় শেরবাহাদুরের মুখটা ঝলমল করছিল। ফস করে বলে বসল, “তুমিও চলো না টুবলু।

তোমার তো দশ ক্লাসের পরীক্ষা হয়ে গিয়ে এখন ছুটি।”

॥ ৪ ॥

মাত্র চারদিনের মধ্যে অপনেশবাবু সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। টুবলুকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথাটা একেবারে অপনেশবাবু সঙ্গে-সঙ্গে লুফে নিয়েছিলেন। সুমিতবাবু, রিনাদেবীর টুবলুর যাওয়ার ব্যাপারে কোনও আপত্তি ছিল না। কারণ, সুমিতবাবুর কোর্টের বড় দু’টো মামলার ব্যস্ততায় মাধ্যমিক পরীক্ষার পর টুবলুকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়নি। কিন্তু একটু অস্বস্তি ছিল অন্য একটা কারণে। কারণ, অপনেশবাবু একাই সব খরচপাতি করছিলেন। আকারে-ইঙ্গিতে প্রসঙ্গটা তুলতেই অপনেশবাবু অভিভাবকসুলভ মেজাজে সেটাকে উড়িয়েই দিয়েছেন। উলটে বলেছেন, টুবলু গেলে ওঁর কত সুবিধে হবে। নিজের টিমটা মজবুত হবে। আর শেরবাহাদুর তো বেজায় খুশি। মনে-মনে বহুদিন স্বপ্ন পুষেছিল, কোনও একদিন টুবলুকে ওদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যাবে। সুযোগটা দারুণ ভাবে চলে এসেছে।

যে স্লাইডের ফোটোটাকে ঘিরে এত আয়োজন, সকলেরই ইচ্ছে করছিল সেই ফোটোটা প্রজেক্টরে একদিন দ্যাখেন। যাওয়ার আগের দিন শেরবাহাদুর সমেত সকলকে অপনেশবাবু আর শ্রীময়ীদেবী ডিনারে নেমন্তন্ন করলেন।

বেচারা অর্ণব। এভাবে যে টুবলুর কপালে একটা বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ হয়ে যাবে, তাও অনুজার সঙ্গে, তাতে যেন একটু হিংসেই হচ্ছে। টুবলুও ব্যাপারটা অনুমান করে জেঠতুতো দাদার পিছনে কম লাগছে না। এই যেমন সন্ধেবেলায় অপনেশবাবুদের বাড়ি যাওয়ার সময় সামনের একটা বাসের পিছনটা দেখিয়ে টুবলু বলেছিল, “দাদাই, কী লেখা আছে, দ্যাখ তো?”

অর্ণব সরল মনে পড়েছিল, “দেখবি আর জ্বলবি, লুচির মতো ফুলবি।”

ব্যাপারটা যে টুবলু পিছনে লাগছে, সেটা বুঝে ফেলার আগেই সকলে হোহো করে হেসে উঠেছিলেন। এমনকী, ড্রাইভার রামশপথও সকলে হাসছে দেখে কিছু না বুঝেই হেসে উঠেছিল। সেই থেকে অর্ণব খুব গম্ভীর হয়ে আছে।

অপনেশবাবুদের বাড়িতে পৌঁছে ঘর অন্ধকার করে প্রজেক্টরে যখন প্রথম স্লাইডটা চালালেন অপনেশবাবু, সবচেয়ে মুগ্ধ হল শেরবাহাদুর। অত বড় স্ক্রিনে জ্বলজ্বল করছে তার নিজের দেশ। সব যেন একেবারে জীবন্ত। দোকানপাট, মানুষজন, পাথুরে জমি আর মাথা উঁচু করে থাকা সবচেয়ে বড় পাহাড়ের সাদা চূড়াটা। মোহাবিষ্ট হয়ে শেরবাহাদুর কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে উঠল, “জয় চোমোলুঙ্গমা।”

অন্ধকারের মধ্যেই অপনেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “বুঝতে পারলি টুবলু, চোমোলুঙ্গমা কী?”

টুবলু আন্দাজ করেছিল। তবে উত্তর দেওয়ার আগেই অর্ণবই উত্তরটা দিয়ে দিল, “এভারেস্ট বোধ হয়।”

“কারেক্ট অর্ণব,” অপনেশবাবু তারিফ করে বললেন, “স্থানীয়রা বহু যুগ ধরে এভারেস্টকে চোমোলুঙ্গমা বা উচ্চারণ ভেদে চেমোলাংমা বলে। এভারেস্টের আর একটা নাম কী জানো?”

এবার আর আন্দাজে ঢিল ছুড়ে অর্ণব পারল না। উত্তরটা দিয়ে দিল অনুজা, “সাগরমাথা।”

অপনেশবাবু বলতে থাকলেন, “ওই যে চূড়াটা দেখছ, তার একটা ফেসে...”

অপনেশবাবুকে থামিয়ে শ্রীময়ীদেবী তাড়া দিয়ে উঠলেন, “তুমি সেই একটা ফোটোতেই দাঁড়িয়ে থেকো না তো। আসল স্লাইডটা দেখিয়ে দাও। সবাই এসেছে, একটু গল্পগুজব করব তো?”

অপনেশবাবু স্লাইডগুলো এর পর একটু দ্রুত চালাতে-চালাতে সেই দোকানের ভিতর স্লাইডটায় এনে দাঁড় করিয়ে বললেন, “শেরবাহাদুর, এই দোকানটা চিনতে পারছ?”

ফোটোগুলো দেখতে-দেখতে আগেই শেরবাহাদুর নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছিল ফোটোগুলো নামচেবাজার অঞ্চলে তোলা। তবে দোকানের ভিতর ফোটোটা অনেকক্ষণ মন দিয়ে দেখল। দোকানের ভিতরে অজস্র রকমের জিনিস অগোছালো হয়ে আছে। কোনওটা ভারতের, কোনওটা চিনের, কোনওটা তিব্বতের। তা ছাড়া সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিসও প্রচুর রয়েছে। এরকম দোকান নামচেবাজারে প্রচুর। তার উপর দোকানির কোনও ফোটো নেই। তা হলে মুখচেনা কাউকে দেখে ফেলার সম্ভাবনা ছিল। অনেক চেষ্টা করেও তাই শেরবাহাদুর দোকানটাকে চিনতে পারল না।

দোকানের ভিতর ঠাসা জিনিসপত্তরের মাঝে সকলে ততক্ষণে ক্যামেরাটা খুঁজছিল। শেষ পর্যন্ত অপনেশবাবুই চিনিয়ে দিলেন ক্যামেরাটাকে। এত বড় প্রজেকশনেও ক্যামেরাটা চিনে নেওয়া সত্যি দুষ্কর। রিনাদেবী বললেন, “সত্যি অপনেশদা, আপনার চোখ আছে।”

সুমিতবাবু বলে উঠলেন, “হাইকোর্টে এই গভীর

পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার জন্য অপনেশদার বিশেষ খ্যাতি আছে।”

প্রশংসাটা গায়ে না মেখে অপনেশবাবু বললেন, “কোনও বিশেষ ক্ষমতা নয়। ভাগ্য বলতে পার। ক্যালেন্ডারে বছর-মাসটা খুঁজে পাওয়ার পর ওই সময় কী-কী জিনিস বিক্রি হত, জানার খুব আগ্রহ হচ্ছিল। তাই স্ক্রিন থেকে মোবাইলে ফোটো তুলে-তুলে জুম করে দেখছিলাম। তাতেই এই অবিশ্বাস্য আবিষ্কারটা হয়ে গেল। ভাগ্য, শিয়ার লাক বলতে পার।”

শ্রীময়ীদেবী যোগ করলেন, “তারপর থেকেই তোমাদের দাদা একেবারে নাওয়া-খাওয়া ভুলেছেন। এতবার করে ডাক্তার বারণ করে দিয়েছে...।”

অপনেশবাবু বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, “আহা, ডাক্তারের কথাটা তো অমান্য করছি না। কোনও স্ট্রেস নিচ্ছি না। পুরোটাই ফ্লাইটে যাব। তা ছাড়া আমার দেখাশোনার জন্য তিন-তিনজন সঙ্গে যাচ্ছে।”

“আপনি কি প্রজেক্টরটা সঙ্গে নিয়ে যাবেন?” রিনাদেবী জিজ্ঞেস করলেন।

“না, তবে একটা ছোট ভিউ ফাইন্ডার আছে, সেটা নিয়ে যাব। কারণ, ওখানে গিয়ে দোকানটাকে খুঁজে বের করতে স্লাইডগুলো হয়তো বারবার দেখার প্রয়োজন হবে।”

“আমি সব ফোটো মোবাইলের ক্যামেরায় তুলে নিয়ে ব্লুটুথ দিয়ে আপনার মোবাইলে পাঠিয়ে দেব,” অর্ণব আপ্রাণ চেষ্টা করছে এই মিশনে নিজের একটা ভূমিকা রাখতে। অর্ণবকে হতাশ করে অনুজা বলল, “সেটা অলরেডি আমি আমার আইপ্যাডে করে নিয়েছি।”

“আচ্ছা অপনেশদা!” সুমিতবাবু নিজের ওকালতি প্রশ্ন শুরু করলেন, “নামচেবাজার থেকে এভারেস্ট তো অনেক দূর। আমি নেটে পড়ছিলাম, তাতে দেখলাম, নামচেবাজার থেকে এভারেস্ট বেস ক্যাম্প যেতেই ছ’-সাতদিনের ট্রেকিং। তারপর তো মূল এভারেস্টের চূড়া আরও বহুদিনের ব্যাপার। যদি ধরেও নিই ওটা ম্যালোরিরই ক্যামেরা। তা হলে প্রশ্ন হচ্ছে, ওটা নামচেবাজারে এল কীভাবে?”

“এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, কিন্তু উত্তরটা বোধ হয় সহজ। যারা এভারেস্ট অভিযানে যায় বা এমনকী, এভারেস্ট বেস ক্যাম্প কালাপাথরে যায়, তারা নামচেবাজার অঞ্চল থেকে শেরপাদের আর মাল বইবার জন্য লোকদের নিয়ে যায়। সুতরাং এভারেস্ট যাওয়ার পথে শেরপাদের আর মালবাহকদের একটা হাব নামচেবাজার। অতএব শেরপারা বা মালবাহকরা এরকম কিছু পেয়ে থাকলে হয়তো নামচেবাজারে বিক্রি করে থাকতে পারে।”

শেরবাহাদুর সমর্থন করে বলে উঠল, “হ্যাঁ সাহেব, অনেক সময় ওজন কমানোর জন্য অনেকে অনেক কিছু ফেলে যায়, অনেক সময় ক্যাম্প শেষে অনেকে শেরপাদের অনেক কিছু উপহার দিয়ে যায়। অনেক সময় অভিযাত্রীদের ফেরার সময় টাকাপয়সা ফুরিয়ে গেলে অনেকে জিনিসপত্তর বিক্রি করে দেয়। তা ছাড়া রাস্তাতেও অনেক কিছু কুড়িয়ে পাওয়া যায়। শুনেছি, ম্যালোরিসাহেব পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। হয়তো ওঁর ক্যামেরাটা ছিটকে অন্য কোনও জায়গায় বরফ চাপা পড়েছিল। বরফ গলাতে কেউ খুঁজে পেয়ে নামচেবাজারে নিয়ে এসেছিল। তারপর দু’ পয়সা কামাবার জন্য বিক্রি করে দিয়েছিল।”

অপনেশবাবু দু’ হাতের পাতা মেলে বললেন, “সুতরাং বুঝতেই পারছ, এভারেস্টের কোল থেকে নামচেবাজারে ক্যামেরাটা পৌঁছে যাওয়ার অনেক রাস্তা আছে। যে পেয়েছিল, সে হয়তো এর মূল্য অনুমান করতে পারেনি।”

শ্রীময়ীদেবী বললেন, “অনেক হয়েছে, এবার ফোটো দেখা বন্ধ করো।”

অপনেশবাবু প্রজেক্টরের আলো বন্ধ করে ঘরের আলোগুলো জ্বালিয়ে দিলেন। কিন্তু শ্রীময়ীদেবী যতই অন্য গল্প করার অজুহাত পাড়ুন, এভারেস্টের গল্প থামল না। সুমিতবাবু বললেন, “ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে ম্যালোরির মৃতদেহটা পঁচাত্তর বছর পর কীভাবে পাওয়া গেল?”

অপনেশবাবু বললেন, “তা হলে তো আর একবার ঘরের আলো নেভাতে হয়, তোমাদের এভারেস্টে ওঠার ফোটোটা একবার দেখাতে হয়।”

বিষয়টা সবার কাছে এমন ইন্টারেস্টিং লাগছিল যে, শ্রীময়ীদেবীর কোনও আপত্তি টিকল না। অপনেশবাবু এবার নিজের একটা স্লাইড বেছে এনে প্রজেক্টরে ভরলেন। স্ক্রিনে ফুটে উঠল এভারেস্টের একটা স্কেচ আর কিছু লেখা। সেদিকে দেখিয়ে অপনেশবাবু বলতে শুরু করলেন, ‘ভাল করে ফোটোটা দ্যাখো। এভারেস্টের চূড়াটা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছনোর জন্য এখন অনেক রুট আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে পপুলার রুট হচ্ছে দু’টো। একটা নেপালের দিক থেকে সাউথ ইস্ট কল বা দক্ষিণ-পূর্ব শৈলশিরা হয়ে,

অন্যটা তিব্বতের দিক দিয়ে নর্থ কল বা উত্তর শৈলশিরা। তোমরা যদি নর্থ কলের শেষ পথটুকু দ্যাখো, যেটা দিয়ে ম্যালোরি আর আরভিন উঠছিলেন, সেখানে দ্যাখো একেবারে চূড়ায় ওঠার আগে দু'টো ধাপের মতো আছে। নীচের ধাপটাকে 'ফার্স্ট স্টেপ' আর উপরের ধাপটাকে 'সেকেন্ড স্টেপ' বলে। ফোটোয় জায়গাটা কাছাকাছি দেখালেও দু'টো ধাপের মধ্যে দূরত্ব বেশ কিছুটা এবং দু'টো স্টেপের মধ্যবর্তী জায়গাটার মধ্যে একটা বিশাল গিরিখাত বয়ে যাওয়ায় একটা স্টেপ থেকে অন্যটায় যাওয়া অত্যন্ত দুর্গম। এই রুটে এভারেস্টে উঠতে এটাই সবচেয়ে বড় বাধা। একবার সেকেন্ড স্টেপে পৌঁছে যেতে পারলে এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছতে আর বড় কোনও বাধা নেই। এখন অবশ্য একদল চিনে অভিযাত্রী দু'টো স্টেপের মধ্যে একটা মই ফেলে রেখেছেন, যেটা এই রুটের অভিযাত্রীরা এখন ব্যবহার করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ম্যালোরি আর আরভিনের সময় সেসব কিছু ছিল না। মনে আছে নিশ্চয়ই, আগের দিন বলেছিলাম, ওডেল নিজের ক্যাম্প থেকে দূরে দূরবিনে খুব ক্ষুদ্র একটা মানুষকে শীর্ষের দিকে উঠতে দেখেছিলেন। কিন্তু পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে উনি নিশ্চিত হতে পারেননি, উনি ক্ষুদ্র মানুষটাকে ফার্স্ট স্টেপে দেখেছিলেন না সেকেন্ড স্টেপে। তারপরেই কালো মেঘে ঢেকে গিয়েছিল সব কিছু। ম্যালোরির মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল এই দু'টো স্টেপের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অনেক কঠিন অনুসন্ধান করে। তাই প্রশ্ন থেকেই যায়, উনি ওঠার সময় দুর্ঘটনায় পড়ে গিয়েছিলেন, না নামার সময়। আরও প্রশ্ন আছে।"

শ্রীময়ীদেবী এবার রীতিমত প্রতিবাদ করে উঠলেন, "আমার অনেক কষ্টের করা রান্না এবার ঠান্ডা হচ্ছে। তাই আর কোনও প্রশ্ন নয়। খাওয়ার টেবিলে সকলে চলো প্লিজ। কাল সকালে তো আবার তোমাদের ফ্লাইট।"

খেতে বসেও অবশ্য এ আলোচনা থামল না। টুবলুর মনে হল অর্ণব যেন স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করছে। গরম মাছের চপে ফুঁ দিতে-দিতে বলল, "আমার মনে হয়, আপনারা যখন ক্যামেরাটা অনুসন্ধান করতে যাচ্ছেনই, আমাদের দরকার এই সময়টায় আলেকজান্ডারকে ক্রমাগত কনফিউজ করে যাওয়া, যাতে উনি ওঁর যাওয়ার সিদ্ধান্তটা নিয়ে দোনামনা করেন।"

"কীরকম?" অপনেশবাবু জানতে চাইলেন।

"আমি করে দিতে পারি, যদি আপনি একটা পারমিশন দেন," চপে কামড় দিয়ে অর্ণব বলতে থাকল, "দেখুন, আপনি যখন নামচেবাজারের দিকে যাবেন, তখন তো আপনি আর ব্লগ লিখতে পারবেন না। কিন্তু আপনি যদি আপনার পাসওয়ার্ডটা আমাকে দিয়ে রাখেন, আমি সমানে আপনার নামে ব্লগ লিখে যাব। আলেকজান্ডারকে কনফিউজ করে যাব। আলেকজান্ডার ধারণাই করতে পারবেন না, আপনি কোথায় আছেন।"

অপনেশবাবু চুপ করে কিছুক্ষণ অর্ণবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর সোল্লাসে বলে উঠলেন, "ওয়ান্ডারফুল! এই আইডিয়াটা তো আমার মাথায় আসেনি। দারুণ হবে ওটা। খেয়ে উঠেই আমি আমার পাসওয়ার্ডটা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। এই টাস্কটা তা হলে তুমি সামলিও।"

॥ ৫ ॥

কাঠমন্ডুতে এসে শেরবাহাদুর একদম মুগ্ধ। তার প্রধান কারণ, জীবনে প্রথমবার প্লেনে চাপল। সহজ-সরল মানুষটার এর জন্য অপনেশবাবুর উপর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আবার ম্যালোরির ক্যামেরাটার সূত্র দেওয়ার জন্য অপনেশবাবুরও যেন শেরবাহাদুরের উপর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তবে এই পারস্পরিক কৃতজ্ঞতার ব্যাপারটা বেশ লাগছে টুবলুর। প্লেনে পাশাপাশি সিটে বসে ছিলেন অপনেশবাবু আর শেরবাহাদুর। গোটা উড়ানটায় অপনেশবাবু ভুলভাল বাঙালি হিন্দিতে শেরবাহাদুরের সঙ্গে গল্প করে গিয়েছেন। আইলের অন্য দিকে অনুজা আর টুবলু পাশাপাশি বসে ছিল। সারাটা সময় ওরা ক্রিকেট আর সিনেমা নিয়ে গল্প করে গিয়েছে।

ড্রাইভার রামশপথকে নিয়ে হুড়তে-পুড়তে আজ একদম শেষ মুহূর্তে দমদম এয়ারপোর্টে ওদের সি অফ করতে হাজির হয়েছিল অর্ণব। সঙ্গে একটা ফাইলে কয়েকটা প্রিন্ট আউট। মুখে বলল, সারা রাত নাকি ইন্টারনেটে ঘেঁটে এই সব ডকুমেন্ট জোগাড় করেছে। অপনেশবাবু ফাইলটা পেয়ে খুব খুশি। প্রথম ফোটোটাই কোডাক ভেস্টপকেট ক্যামেরার। অপনেশবাবু যখন বললেন, "গুড জব," তখন অর্ণবের মুখটা একেবারে গদগদ। তবে টুবলু মুচকি হেসেছিল। আসলে অর্ণব তো কিচ্ছু খাটেনি। গুগ্‌লে কয়েকটা সার্চ করে নিশ্চয়ই এই প্রিন্ট আউটের ফাইলটা করে নিয়ে এসেছে। দরকার ছিল শুধু হবু শ্বশুরমশাইকে একটু ইমপ্রেস করার।

কাঠমন্ডুর হোটেলের বারান্দায় বসে যখন রসিয়ে-রসিয়ে এই কথাটা অনুজাকে বলছিল টুবলু, "আমি তোমাকে হলফ করে বলতে পারি, দাদাই ওই ম্যালোরি-

আরভিনের নাম এর আগে জীবনে কখনও শোনেনি। ওসবে ওর ইন্টারেস্টই নেই। আর সে কিনা রাতারাতি একটা ফাইল বানিয়ে ফেলল!”

অনুজা খিলখিল করে হাসতে-হাসতে মোবাইলটা তুলে বলল, “দাঁড়া, তোর দাদাইকে বলছি।”

“এই তো দিদি তুমিও দেখছি এবার দাদাইয়ের সঙ্গে কথা বলার একটা বাহানা পেয়ে গেলে।”

টুবলু অনুজাকে দাদাইয়ের সঙ্গে একান্তে কথা বলার সুযোগ করে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কাঠমন্ডুতে এই প্রথম এল টুবলু। শহরটা বেশ অন্যরকম। একটু ঘুরে দেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সেটা আর আজ হবে না। অপনেশবাবু বলে রেখেছেন ফেরার পথে কাঠমন্ডু ঘুরে দেখবেন। আসলে আজ কলকাতা থেকে দুপুরের ফ্লাইট ছিল। ফ্লাইটটা লেট করে ছেড়েছিল। কাঠমন্ডুর হোটেলে এসে চেক ইন করতে-করতে সন্ধে হয়ে গিয়েছে। আর অপনেশবাবু কাল ভোরেই নামচেবাজার যাওয়ার জন্য লুকলা যাওয়ার ফ্লাইটের টিকিট কেটে রেখেছেন। অপনেশবাবু চাইছিলেন না কাঠমন্ডুতে ঘোরাঘুরি করে কেউ টায়ার্ড হয়ে পড়ুক।

হোটেলটা বেশ ভাল। অপনেশবাবু দু’টো ঘর নিয়েছেন। একটা ডাবল, একটা সিঙ্গল। বড় ঘরটা তিন বেডের। এই ঘরটায় অপনেশবাবু আছেন অনুজা আর টুবলুকে নিয়ে। আর একটা ছোট সিঙ্গল বেডের রুম। সেখানে শেরবাহাদুর আছে। আর তাতেই শেরবাহাদুরের কষ্ট কাটছে না।

ঘরে ঢুকে টুবলু দেখল অপনেশবাবু মন দিয়ে একটা বই পড়ছেন। টুবলুকে দেখে বললেন, “শোন! আমাদের উকিলদের একটা বদনাম আছে জানিস তো? কাজ হাসিল করতে আমরা মাঝে-মাঝে মিথ্যে কথা বলি। তোর জেঠিমাকে সেরকম একটা মিথ্যে বলে এসেছি। বলেছি, আমরা ফ্লাইটে এখান থেকে লুকলা যাব, তারপর হেলিকপ্টারে নামচে। আসলে কিন্তু আমরা লুকলা থেকে ট্রেকিং করে নামচে যাব। পারবি তো?”

টুবলুর আঁতে লাগল। যদি অনুজাদিদি পারে, তা হলে ও পারবে না কেন? কিন্তু চিন্তা হল অপনেশবাবুর স্বাস্থ্য নিয়ে। বাবা-মা বারবার বলে রেখেছেন, ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে। টুবলু বলল, “অনুজাদিদি জানে?”

“এখনও জানে না। তুই বুঝিয়ে বলবি। আমরা লুকলা থেকে চেপলুং হয়ে ফাকদিং যাব। ফাকদিংয়ে একদিন বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন নামচে যাব। এই রাস্তাটা দেখবি। কখনও এভারেস্ট দেখতে পাবি, কখনও জঙ্গল পাবি। একেবারে ‘আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড’ এক্সপিরিয়েন্স হবে

তোর। কিন্তু যাঁর ক্যামেরার খোঁজে যাচ্ছি, আয় তোকে সেই ম্যালোরির বীরত্বের গল্প শোনাই। ম্যালোরি কিন্তু ১৯২২ সালে ব্রিটিশ ব্রিগেডিয়ার ব্রুসের নেতৃত্বে প্রথমবার এভারেস্ট জয়ের চেষ্টা করেছিলেন। অনেক দূর এগিয়েও তিন-তিনবার শীর্ষে ওঠার চেষ্টা করে পারেননি। শেষ চেষ্টার সময় এক তুষার ঝড়ে অনেক শেরপা মারা যাওয়ায় অভিযান পরিত্যক্ত করে ফিরে এসেছিলেন। ১৯২৪ সালে ওঁর আবার অভিযানে যাওয়ার কথাই ছিল না। কিন্তু এভারেস্ট যাঁকে চিরদিন নিজের কোলে রেখে দেবে বলে ঠিক করেছে, তাঁকে ঠেকায় কে!"

এই ক'দিন ম্যালোরি-ম্যালোরি শুনতে-শুনতে টুবলুরও একটা আগ্রহ জন্মে গিয়েছে। জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা জেঠু, ম্যালোরি যে এভারেস্ট জয় করতে পেরেছিলেন, তার আর কোনও যুক্তি নেই?"

আলোচনাটার সূত্রপাত হওয়ায় অপনেশবাবু খুশি হলেন। বললেন, "স্বপক্ষে যুক্তি তো অনেক আছে। তার দু'টো খুব স্ট্রং। ম্যালোরির কন্যা পরে জানিয়েছিলেন যে, ম্যালোরি ওঁর স্ত্রীর একটা ফোটো সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং জানিয়েছিলেন সেই ফোটোটা এভারেস্টের উপর রেখে আসবেন। ম্যালোরির মৃতদেহ যখন পাওয়া গেল, তখন ওঁর পোশাকের পকেটে অনেক ছোটখাটো জিনিস, এমনকী, কয়েকটা চিঠিপত্তর পাওয়া গেলেও ওঁর স্ত্রীর ফোটোটা পাওয়া যায়নি। যেটা প্রমাণ করে উনি সম্ভবত এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছতে পেরেছিলেন এবং সেখানেই ওঁর স্ত্রীর ফোটোটাকে রেখে এসেছিলেন। আর একটা যুক্তি হল..."

অপনেশবাবুর কথা শেষ হল না। অনুজা ঘরে ঢুকে বলল, "বাবা, অর্ণব একটা নিউজ দিল! ও ব্লগটায় তোমার নামে একটা লেখা পোস্ট করেছে, তার রেসপন্ডও আসছে।"

"বেশ তো। কী লিখেছে?"

"উফ! কনফিউজ করতে তোমার নামে লিখেছে, তোমার এখন হাতে একদম পয়সা নেই। পয়সা জমাচ্ছ। জমলেই নামচেবাজার যাবে।"

অপনেশবাবু হোহো করে হেসে উঠে বললেন, "আলেকজান্ডার কিন্তু খুব ধূর্ত। এসবে বুঝে যাবেন। অর্ণবের সঙ্গে পরের বার যখন কথা হবে, বলে দিস আরও বুদ্ধি করে যেন কিছু লেখে। তা আলেকজান্ডার কিছু উত্তরে লিখেছেন নাকি?"

"আলেকজান্ডার কিছু লেখেননি, তবে ড্যানিয়েল লিখেছেন। লিখেছেন, ওঁদের দেশের মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন থেকে উনি একটা খবর পেয়েছে। ওদের দেশের এক সাহেব নামচেবাজারের রাস্তায় মাটিতে চট বিছিয়ে বিক্রি করা পুরনো জিনিসের সম্ভারে এইরকম একটা ক্যামেরা দেখে খুব আশ্চর্য হয়েছিলেন। অব্যর্থ ভাবে ম্যালোরির ক্যামেরা ভেবে মাত্র এক ডলার দিয়ে ক্যামেরাটা কিনলেও খুব যত্ন করে নিজের দেশে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর বহু ডলার খরচ করে স্পেশ্যাল ল্যাবরেটরিতে ক্যামেরাটা খুলে দেখেছিলেন, ভিতরে ফিল্ম রোলটাই নেই।"

অপনেশবাবু এবার চিন্তিত হলেন, "ড্যানিয়েলকে আমি যতটা চিনেছি, ছেলেটা সিরিয়াস। তবে যে লোকটার কথা বলছে, সে কেমন লোক আমাদের জানা নেই। ম্যালোরির ক্যামেরা নিয়ে গোটা পৃথিবীতে অনেক গল্প আছে। ড্যানিয়েলের লোকটার কথার দু'টো দিক থাকতে পারে। এক, লোকটা সত্যি বলছে, আর দুই, লোকটা মিথ্যে বলেছে। যদি সত্যি বলে থাকে, তা হলে আমাদের যাওয়াটা বেকার। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে লোকটা মিথ্যে বলেছে।"

"কেন?" টুবলু আর অনুজা সমস্বরে বলে উঠল।

"আমি সেই পুরনো যুক্তিই দেব। সে যদি ম্যালোরির ক্যামেরা ভেবে নামচেবাজার থেকে কোডাক ভেস্টপকেটটা কিনে যত্ন করে নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে খুলে ফিল্ম রোল না পেয়ে থাকে, এত বড় ঘটনাটা ইন্টারনেটে কোথাও না-কোথাও কেউ লিখতই।"

টুবলু অপনেশবাবুর কথা শুনতে-শুনতে ভাবছিল ভদ্রলোক কেন এত নামী উকিল। চটজলদি যুক্তি খুঁজে বের করেন। ওঁর কথা শেষ হতে বলল, "কিন্তু আলেকজান্ডার কিছু লিখলেন না কেন?"

"ও হয়তো আমাদের মতো রাস্তায় আছে। হয়তো নেপালে পৌঁছেও গিয়েছে। আমরা উকিলরা সবসময় রেয়ারেস্ট পসিবিলিটি ঘেঁটে ঠিক উত্তর পাই।"

"কিন্তু লোকটা অনুমানও করতে পারছেন না আমরাও নেপালে চলে এসেছি," অনুজা উত্তেজিত হয়ে বলল।

অপনেশবাবু অনুজাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হয়তো পারছেন। লোককে আন্ডার এস্টিমেট করিস না। তোর আইপ্যাডটা এনেছিস তো? ব্লগটা খোল তো। নিজের চোখে পড়ি কে কী লিখছে।"

"এনেছি, কিন্তু সিম কার্ডটা ঠিক কাজ করছে না বলে ইন্টারনেট ধরতে পারছি না। তোমার ফোনে দ্যাখো না, যদি ইন্টারনেটটা ধরতে পার।"

অপনেশবাবু বললেন, “তোদের একটা কথা বলে রাখি, আমি কিন্তু আমার মোবাইলটা এখানে সুইচ অফ করেই রাখছি। এখানে এসে মিনিটে-মিনিটে আর মক্কেলদের ঝুটঝামেলার ফোন ভাল লাগছে না। সুমিত আর অর্ণবকে বলে রাখিস কথাটা। আমাকে যোগাযোগ করার দরকার হলে যেন তোদের ফোনে বা শেরবাহাদুরের ফোনে করে।”

“অর্ণব বলছে ব্লগটায় সর্বক্ষণ খেয়াল রাখছে। কারও কোনও কমেন্ট এলেই সঙ্গে-সঙ্গে জানাবে।”

টুবলু বলল, “হোটেলের লবিতে ইন্টারনেট আছে। ওখানে গিয়ে চেক করে নিতে পারেন জেঠু।”

অপনেশবাবু সাবধান করে উঠলেন, “পাবলিক প্লেসে একদম নয়। আমরা এখনও জানি না আলেকজান্ডার কোথায় আছেন। ভাগ্য খারাপ থাকলে হয়তো এই হোটেলেই আছেন। ওঁর মুখটা দেখতে কেমন, সেটা না জানা আমাদের যেমন একটা অ্যাডভান্টেজ পাইয়ে দেওয়ার কোনও চান্স দিবি না। চলো, এবার খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ি। কালকের ফ্লাইট ধরতে ভোর চারটেয় হোটেল থেকে বেরোতে হবে, মানে বুঝতে পারছিস তো? মাঝরাতে উঠতে হবে। ডিনারের জন্য শেরবাহাদুরকে ডাইনিং হলে চলে আসতে বল।”

॥ ৬ ॥

টুবলু খুব বেশি প্লেনে চড়েনি। এক অর্থে এবার নেপাল আসাটাই টুবলুর জীবনে প্রথম বিদেশযাত্রা। তা এই বিদেশযাত্রায় এরকম একটা প্লেনে চাপার অভিজ্ঞতাও যে হবে, টুবলু ভাবেনি।

ভাল করে আলো ফোটেনি, তবু এত ভোরবেলায়ই এয়ারপোর্টে খুব ভিড়। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তাদের অধিকাংশই ট্রেকার। বেশির ভাগই সাহেব-মেম। সিকিওরিটি চেকিং সেরে বাসে চেপে যখন লুকলা যাওয়ার প্লেনটার সামনে এসে দাঁড়াল টুবলু, একটু থমকে গেল। ছোট্ট একটা প্লেন। তার দু’ ডানায় প্রপেলার লাগানো। টুবলুর ধারণা ছিল, এই জেট প্লেনের আমলে ওরকম প্রপেলার লাগানো প্লেনের আর অস্তিত্বই নেই। প্লেনের ভিতরটাও অদ্ভুত। আইলের দু’ ধারে এক সার করে সিট। এবার আর অনুজার পাশে বসা হল না। আইলের এপাশ-ওপাশ করে অনুজা আর টুবলু বসল। আর সামনে দু’দিকে অপনেশবাবু আর শেরবাহাদুর। অনুজা যেন একটু ভয়ই পাচ্ছিল। বলল, “হ্যাঁ রে টুবলু, এই প্লেন শেষ পর্যন্ত উড়ে পৌঁছতে পারবে তো?”

টুবলু মুখ ঘুরিয়ে দেখল, এই আশঙ্কা যেন সাহেব-মেমদেরও। ওদের মুখেও একটা চিন্তার ছাপ। একমাত্র নির্ভীক মুখ দেখল শেরবাহাদুরের। খুব আত্মতৃপ্ত একটা মুখ নিয়ে জানলার বাইরের দিকে চেয়ে সিটবেল্ট আটকে বসে আছে। প্লেনটায় মাত্র কুড়িটা সিট। একটুখানি সময়ের মধ্যেই তার সব ক’টা ভর্তি হয়ে যাওয়ার পরে-পরেই প্লেনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। একজন এয়ার হোস্টেস এসে ছোট-ছোট তুলোর বল দিয়ে বলে গেল, ওগুলো কানে গুঁজে নিতে। সেটা করতে-করতেই প্লেনের ইঞ্জিন গোঁগোঁ আওয়াজ করতে-করতে দুলে উঠল।

আর-একটা নতুন জিনিস দেখার অভিজ্ঞতা হল টুবলুর। সামনে ককপিটের দরজাটা খোলা। প্লেনের সামনের কাচের জানলাটা দু’জন পাইলটের মধ্যিখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে দেখল, রানওয়ে দিয়ে প্লেনটা শাঁ শাঁ করে দৌড়তে শুরু করেছে। সোজা যেন রানওয়ের শেষে কোথাও গিয়ে ধাক্কা মারবে। বুকের ধকপুকুনি বাড়িয়ে তার মধ্যেই টুক করে আকাশে উঠে গেল প্লেনটা। তার পরের দৃশ্য অনবদ্য।

তুলো-তুলো সাদা মেঘের সঙ্গে খেলা করতে-করতে প্লেনটা পাখির মতো উড়ে চলেছে। কাঠমন্ডু শহর ছাড়াতেই সকালের নরম রোদ মেখে সবুজ পাহাড়ি জঙ্গল, মাঝে-মাঝে মখমলের মতো সবুজ খেত, আঁকাবাঁকা নদী, ছোট-ছোট গ্রাম আর ডান দিকের জানলা দিয়ে হিমালয় পর্বতমালা। প্লেনটা উড়ছে। কখনও দেখা যাচ্ছে সামনে একটা পাহাড়ের চূড়া এগিয়ে আসছে। প্লেনটা যেন গিয়ে ধাক্কা মারবে ওই পাহাড়ের চুড়োয়। সকলে আঁতকে ওঠার আগেই প্লেনটা টুক করে টপকে যাচ্ছে পাহাড়ের চূড়াটা। বুকের ধাক্কা সামলে আবার সকলে মুগ্ধ হয়ে হিমালয়ের বরফঢাকা চুড়োগুলোকে দেখছে, পটাপট ফোটো তুলছে। তার মধ্যেই অপনেশবাবু একটা চূড়া চিনিয়ে দিলেন। গৌরীশঙ্কর চুড়ো।

আদপে আধঘণ্টা, কিন্তু এই স্বপ্নের উড়ানটা যেন নিমেষেই শেষ হয়ে গেল। লুকলার টারমার্ক দেখা গেল। রানওয়েটা আবার সমতল নয়, ঢালু। মাত্র আধঘণ্টাতেই প্লেনে চড়ার অনেক রকম অভিজ্ঞতা হয়ে গেল টুবলুর। প্লেনের চাকাটা যখন লুকলার তেনজিং হিলারি এয়ারপোর্টের রানওয়েতে এসে থামল, তখন যেন সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। লুকলা এয়ারপোর্টের বাইরে আসতেই অনুজা বলল, “বাবা, তুমি যে বলেছিলে পুরো

রাস্তাটাই ফ্লাইটে যাবে।”

“তোর মাকে শান্ত করার জন্য বলেছিলাম। না হলে তোর মা আসতেই দিত না। আর একটা জায়গা পর্যন্ত হেলিকপ্টারে যাওয়া যেত, কিন্তু এই রাস্তাটায় ট্রেকিং করে হিমালয় দেখার যা মজা, ভাবতে পারবি না। চিন্তা করিস না, অল্প ট্রেকিং। আর তোরা সকলে তো সঙ্গে আছিস। তুই মাকে আর রিনাকে একটা করে ফোন করে নিশ্চিন্ত করে দে, আমরা নিরাপদে লুকলা পৌঁছে গিয়েছি। আর এখান থেকে ট্রেকিং করব, এই কথাটা কিছু বলিস না। টুবলু রুটটা জানে, ওর কাছে জিজ্ঞেস করে নে।”

বলব-বলব করেও টুবলুর কথাটা বলা হয়নি অনুজাকে। খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলার পর অনুজা মুখ গম্ভীর করে বলল, “একটা কন্ডিশন। কোথাও যদি তোমার শরীর খারাপ করে, সেখান থেকেই আমরা ফিরে আসব।”

“ঠিক আছে মা। আর কিছু?”

“তুমি আমার আইপ্যাডের জন্যও একটা সিম কার্ড পাওয়া যায় কি না দেখবে বাবা?”

“রাইট! তোর একটা সিম কার্ড ভরে আইপ্যাডটা দিয়ে ইন্টারনেটে যোগাযোগ রাখাটা কাজে আসতে পারে। দাঁড়া দেখছি।”

এয়ারপোর্টের বাইরে একটা টি-হাউসে অনুজা আর টুবলুকে রেখে শেরবাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে অপনেশবাবু গেলেন সিম কার্ডের খোঁজ করতে। লুকলা জায়গাটা অদ্ভুত। চারদিকে হিমালয়কে আশ্রয় করে অপূর্ব নিসর্গ। আবার জায়গাটা ছোট্টর মধ্যেও জমজমাট। দলে-দলে টেকার্সরা এখানে এসে হাজির। এভারেস্টের পথে হিমালয় অভিযান এখান থেকেই শুরু হল। মূলত এখান থেকেই অনেকে জিনিস বইবার জন্য পোর্টার ঠিক করে। অনুজা শ্রীময়ীদেবীকে ফোন করে চা খেতে-খেতে দেশবিদেশের লোকদের দেখছিল। একসময় বলল, “সিম কার্ডটা যতক্ষণ না আসে, তোর দাদাইকে একবার ফোন করে আলেকজান্ডারের আপডেটটা নে।”

টুবলু অর্ণবের মোবাইলে ফোন করল। অনেকক্ষণ রিং হয়ে গেল ফোনটা। অর্ণব ধরল না। চিন্তিত হয়ে তারপর জেঠিমার মোবাইলে ফোন করল। উনি ধরে বললেন, “তোর দাদাই? সে তো সোফায় চিতপাত হয়ে শুয়ে কখন থেকে ঘুমোচ্ছে। তারপর তোদের কী খবর বল, কোথায় তোরা?”

টুবলু সব সংক্ষেপে জানিয়ে ফোনটা ছেড়ে অনুজাকে বলল, “দাদাইকে এখন পাওয়া যাবে না। কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমোচ্ছে। তোমার সিম কার্ডটা চলে এলে আমরা নিজেরাই ট্র্যাক রাখতে পারব আলেকজান্ডার কী লিখছেন।”

অপনেশবাবু একটু পরেই সিম কার্ড নিয়ে চলে এলেন। অনুজাকে দিয়ে বললেন, “দ্যাখ, এবার তোর আই প্যাডে ইন্টারনেট পাচ্ছিস কি না।” অনুজা অপনেশবাবুর আর শেরবাহাদুরের জন্য চায়ের অর্ডার দিয়ে সিম কার্ডটা লাগাতেই ইন্টারনেট কানেকশন পেয়ে গেল। প্রথমেই ‘সেভ দ্য মাউন্টেন্স ফ্রম ম্যানকাইন্ড’ ওয়েবসাইটের ব্লগটা বার করল। অপনেশবাবু নিজের পাসওয়ার্ডটা বলে দিলেন। লগ ইন করার পর সকলে রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে রইল আই প্যাডের স্ক্রিনটার উপর। আলেকজান্ডারের কোনও বার্তা আছে কি না জানার জন্য।

স্ক্রিনটা ফুটে উঠতে টুবলু ঢোক গিলল। দাদাইয়ের যা কারবার। যথারীতি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। কাল রাত আড়াইটে অপনেশবাবুর নাম করে ব্লগে লিখেছে, ‘হে ব্লগবন্ধুগণ! কখনও ভেবে দেখেছ কি, চিরকাল পাহাড়-পাহাড় করে প্রকৃতির আর কিছু আমাদের দেখা হয়নি। সমুদ্র দেখেছ তোমরা? আমাদের বাড়ির কাছেই দিঘা। বে অফ বেঙ্গল! আহা কী দিগন্তবিস্তৃত নীল জল। দিঘার বিচে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, এই পৃথিবীতে তিন ভাগ জল নিয়ে যে সমুদ্র দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে হিমালয় কত ক্ষুদ্র। অস্কার, ওয়াটসন, ড্যানিয়েল, তোমরা কি সমুদ্র দেখেছ? তোমাদের কমেন্ট জানাও।’ এতটা লিখেও ক্ষান্ত হয়নি অর্ণব। দিঘার সমুদ্রের একটা ফোটোও আপলোড করে দিয়েছে।

টুবলু অপনেশবাবুর মুখের দিকে চাইল। মুখটায় উনি বিরক্তি চেপে রেখেছেন। নেহাত হবু জামাই। নিজেকে যথেষ্ট সামলে বললেন, “অর্ণবকে বলেছিলাম এমন কনফিউজ না করে যাতে লোকের সন্দেহ হয়। মাঝে-মাঝে টাস্কটা গুলিয়ে ফেলছে ও। তলায় দ্যাখ, অর্ণবের পোস্টের উত্তরে কেউ কিছু লিখেছে কিনা।”

ব্লগের তলায় উত্তর পাওয়া গেল। প্রথম ড্যানিয়েল। লিখেছেন, ‘হাই অপনেশ! তুমি কি আমাদের ব্লগের নিয়মের কথা ভুলে গিয়েছ? আমরা শুধু পাহাড় নিয়ে আলোচনা করি। সমুদ্র নয়। প্লিজ ব্লগের নিয়ম রক্ষা করো।’

ড্যানিয়েল লিখেছেন, ‘তুমি কী ম্যালোরির ক্যামেরা নিয়ে সব ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেললে? আমি অবশ্য

আগেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। কারণ, আমার দৃঢ় ধারণা, ম্যালোরির ডেডবডির সঙ্গে ক্যামেরাটা পাওয়া যায়নি এবং আরভিনের ডেডবডিটাকে যেরকম কোনও দিন খুঁজে পাওয়া যায়নি, ম্যালোরির ক্যামেরাটাও তেমনি কোনওদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

এর পরে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং এবং সবচেয়ে প্রতীক্ষিত ব্লগটা আলেকজান্ডারের। লিখেছেন, 'প্রথমে পয়সা জমানোর কথা। তারপরে সমুদ্রের কথা বলে তুমি কাকে কনফিউজ করার চেষ্টা করছ অপনেশ? তুমি পেশায় উকিল হতে পার, কিন্তু আমিও একজন পোড়-খাওয়া মানুষ। আমি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছি যে, তুমি নামচেবাজার যাচ্ছ, আমিও আসছি। তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছ নামচেবাজার জায়গাটায় আমি এতবার গিয়েছি যে, হাতের তালুর মতো জায়গাটা চিনি। ক্যামেরাটা তোমার আগে আমি বার করবই।'

অনুজা আর টুবলুর মুখটা শুকিয়ে গেল। টুবলু বলল, "বুঝলে, দাদাইয়ের সমুদ্র কী কাণ্ডটা করল?"

"একেবারে সর্বনাশ!" চাপা গলায় বলল অনুজা।

অপনেশবাবু শুধু গম্ভীর মুখে বললেন, "আলেকজান্ডার কখন লিখেছেন ব্লগটা?"

"ব্লগে সকলের টাইম তো লন্ডনের টাইম দেখায়।"

"কারণ, আলেকজান্ডারের সার্ভারটা লন্ডনের। ওই টাইমটা থেকে পৌনে ছ' ঘণ্টা যোগ করলেই নেপালের টাইমটা পেয়ে যাবি।"

অনুজা আর টুবলু হিসেব করে দেখল, আলেকজান্ডারের পোস্টটা মাত্র কুড়ি মিনিট আগে লেখা। সেটা শুনে অপনেশবাবু নিজের ঘড়ির দিকে খুব মন দিয়ে তাকিয়ে আরও গম্ভীর গলায় বললেন, "ব্লগটায় আমার নাম করে লিখে দে, চ্যালেঞ্জটা আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম আলেকজান্ডার। কী শেরবাহাদুর, আমরা পারব না?"

"নিশ্চয়ই বড়সাহেব," কপালে হাত ঠেকিয়ে শেরবাহাদুর বলল, "জয় চোমোলুঙ্গমা।"

॥ ৭ ॥

"টাইম ব্যাপারটা আমার কাছে একটা চিরদিনের মিস্ট্রি, বুঝলি তো টুবলু। আমার ওকালতি জীবনে সময় বস্তুটা যেমন অনেক রহস্যভেদ করেছে, আবার সেরকমই ধন্দে ফেলেছে," ট্রেকিং করতে-করতে টুবলুর কাঁধে হাত রেখে অপনেশবাবু বললেন। টুবলু এতক্ষণ অনুজার সঙ্গে হাঁটছিল। ঘুম থেকে উঠে অর্ণব অনুজাকে ফোন করেছে। ওদের একান্তে কথা বলার সুযোগ করে দিয়ে টুবলু অপনেশবাবুর পাশে-পাশে হাঁটছিল। অপনেশবাবু বলতে থাকলেন, "ম্যালোরির মৃতদেহের পকেটে দু'টোয় খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস পাওয়া গিয়েছিল। এক, ওঁর ঘড়ি। আর দুই, ওঁর সানগ্লাস। ঘড়িটা ভাঙা ছিল। মিনিটের কাঁটাটা ছিল না। তবে ঘণ্টার কাঁটাটা এক আর দুইয়ের মাঝামাঝি ছিল। ওডেল দূরবিনে ম্যালোরিকে বেলা ১২:৫০-এ শেষ দেখেছিলেন। ম্যালোরির ভাঙা ঘড়িতে সময়টাকে যদি দেড়টা ধরি, তা হলে প্রশ্ন, সেটা বেলা দেড়টা না রাত্রি দেড়টা। ম্যালোরির পকেটের সানগ্লাসটা আরও ধন্দে ফেলে দিয়েছে। এভারেস্টের ওই বরফের মধ্যে দুপুরে সানগ্লাস পরে না থাকলে মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে অন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। তা হলে কি ম্যালোরি এভারেস্ট জয় করে রাত্রে নামার চেষ্টা করছিলেন?"

"টুবলু!" পিছন থেকে ডাকল অনুজা।

অপনেশবাবু বললেন, "যা, দিদির সঙ্গে-সঙ্গে হাঁট। একা-একা পাহাড়ে হাঁটা খুব ক্লান্তিকর।"

অপনেশবাবু শেরবাহাদুরের পাশে এগিয়ে গেলেন। টুবলুদের জিনিসপত্র অল্প। সবার একটা করে মাত্র স্যাক। তবু অপনেশবাবু চেয়েছিলেন একজন পোর্টার ঠিক করতে। কিন্তু শেরবাহাদুর কিছুতেই শোনেনি। সকলে যেন ওর দেশে অতিথি হয়ে এসেছেন। তা ছাড়া শুরু থেকে অপনেশবাবু শেরবাহাদুরকে যে সৌজন্য দেখিয়েছেন, যে সম্মান দিয়েছেন, এবার যেন শেরবাহাদুরের প্রতিদান দেওয়ার পালা। চা খাওয়ার পর নামচেবাজার যাওয়ার দিকে ট্রেকিংটা শুরু করে দিলেন। রাস্তায় শুধু দলে-দলে দেশবিদেশের ট্রেকার আর পর্বতারোহী।

লুকলা পেরিয়ে পাথুরে রাস্তায় অনুজার সঙ্গে গল্প করতে-করতে হাঁটতে দিব্যি লাগছিল টুবলুর। এ একদম অন্যরকম অভিজ্ঞতা। পৃথিবীর নানা দেশের লোক হেঁটে চলেছেন। কোনও যানবাহন নেই। তবে একটা নতুন জিনিস দেখছে। বড়-বড় শিংওলা ইয়াক। তাদের পিঠ বোঝাই জিনিসপত্তর। শেরবাহাদুর অবশ্য অনুজা আর টুবলুকে সাবধান করে দিয়েছে, ওদের শিঙের কাছাকাছি না যাওয়ার জন্য। কারণ, মুড অফ হলে বিশ্রীভাবে ওরা গুঁতিয়ে দিতে পারে। প্রায় দশ কিলোমিটার মতো রাস্তা আজ হাঁটতে হবে। খুব একটা চড়াই-উতরাই নেই। একটু পরেই ডান দিকে এল দুধকোশী নদী।

শেরবাহাদুর আর অপনেশবাবু একসঙ্গে হাঁটছিলেন।

একটু পিছনে অনুজা আর টুবলু। থেকে-থেকেই ওরা দাঁড়াচ্ছিল, ফোটো তুলছিল। অপনেশবাবুর আলেজকান্ডারকে চ্যালেঞ্জটা ছুড়ে দেওয়ার পর ভিতরে যেন ম্যালোরির ক্যামেরাটা খুঁজে পাওয়ার উত্তেজনাটা বেড়ে গিয়েছে। টুবলুরা পিছিয়ে পড়লেই উনি তাড়া দিচ্ছিলেন এগিয়ে আসতে।

"অনুজাদিদি, তোমার কি মনে হয় ম্যালোরির ক্যামেরাটা আমরা খুঁজে পাব?"

"দ্যাখ, একবার যখন ক্যামেরাটার খোঁজে আমরা এত কষ্ট করে এগিয়ে চলেছি, তখন বাবার মতো আমিও বিশ্বাস করতে শুরু করেছি ক্যামেরাটা আমরা ঠিক খুঁজে পাব। আশাবাদী না হয়ে তো কোনও কাজে এগনো যায় না। কে ভেবেছিল বল, ১৯২৪ সালে মারা যাওয়া জর্জ ম্যালোরির বডিটা ১৯৯৯ সালে খুঁজে পাওয়া যাবে? তবে খুঁজে পাওয়া তো সহজে যায়নি। বাবার কাছে শুনলি না, খুব কঠিন সার্চ অপারেশান করতে হয়েছিল। অত দুর্গম জায়গা, তার মধ্যে অত বছরের পুরনো বডি খুঁজে পাওয়া। বাবা সেদিন বুঝিয়ে বলছিলেন, ওই অপারেশানটা করতে কত ডেটা অ্যানালিসিস করতে হয়েছিল।"

"কিন্তু আমাদের ক্যামেরার সার্চ অপারেশানে তো কোনও ডেটা নেই। যদিও ক্যামেরাটা এখনও নামচেবাজারের কোনও দোকানে থেকে থাকে, সেটা খড়ের মধ্যে সূচ খুঁজে পাওয়ার চেয়েও কঠিন কাজ।"

"কে বলল, আমাদের কোনও ডেটা নেই?" অনুজা গলাটা নামিয়ে বলল, "অর্ণব একটা উপায় বলেছে।"

"তাই?" টুবলু খুব উৎফুল্ল হয়ে বলল, "কীরকম?"

"তার স্লাইডগুলো তুই খেয়াল করেছিস? নাম্বারিং করা আছে। অর্থাৎ যে ক্যামেরা দিয়ে ফোটোগুলো তুলেছিল, সে কী-কী সিকোয়েন্সে ফোটোগুলো তুলেছে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এটা একটা বড় তথ্য।"

"ঠিক। কিন্তু এই সিকোয়েন্সটা আমাদের কীভাবে হেল্প করবে?"

"অর্ণব বাবাকে যে ফাইলটা দিয়েছে, তার মধ্যে নামচেবাজারের একটা ম্যাপের প্রিন্ট আউট আছে। তুই আর আমি নামচেবাজারে ঘুরে-ঘুরে আই প্যাডে তুলে রাখা স্লাইডের ফোটোগুলো মিলিয়ে-মিলিয়ে দেখব, কোন পয়েন্ট থেকে স্লাইডের প্রিন্ট আউটের সঙ্গে ভিউটা মিলে যায়। স্লাইডে যে নম্বরটার সঙ্গে ভিউটা মোটামুটি মিলে যাবে সেই নম্বরটা ম্যাপের উপর সেই জায়গাটায় লিখে রাখব। সব ক'টা নম্বর পড়ে গেলে সেটা জুড়ে ফেললে দোকানটার একটা লোকেশন এস্টিমেট করে ফেলতে পারব।"

দাদাই এই বুদ্ধিটা দিয়েছে। টুবলু শুনে এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, হাঁটার গতি একটু শ্লথ হয়ে গিয়েছিল। অপনেশবাবু আর শেরবাহাদুরের চেয়ে একটু পিছিয়ে পড়েছিল। আকাশটা সাদা মেঘে ঢেকে আছে। অপনেশবাবু একটু অন্য ভাবে তাড়া দিলেন, "কী টুবলু, অসুবিধে হচ্ছে?"

"না, না।"

এবার টুবলু আর অনুজার মাঝখানে এসে গল্প শুরু করলেন, "এই যে এত লোক যাচ্ছে, এদের মধ্যে কেউ-কেউ যাচ্ছে হয়তো এভারেস্ট সামিট করতে। কিন্তু ওদের লটবহর দেখেছ? সাজসরঞ্জাম দেখেছ? কত আধুনিক সাজসরঞ্জাম। ম্যালোরি আর আরভিন এভারেস্টের চূড়ায় উঠে থাকুন বা না থাকুন, তার আসল কৃতিত্বটা কোথায় জানো? সে আমলে নামমাত্র সাজসরঞ্জাম নিয়ে, যার মধ্যে একটা ভাল অক্সিজেন সিলিন্ডার পর্যন্ত ছিল না, কোনও প্রপার রুটম্যাপ ছিল না, সেই নিয়েই ওঁরা একটা অসাধ্য সাধন করার জন্য অসীম মনোবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে ছিলেন।"

হঠাৎই খানিকটা মেঘ সরে গিয়ে দিনের আলো ঝলমল করে উঠল। মুহূর্তে সারা আকাশ জুড়ে দেখা গেল হিমালয়ের অপূর্ব নিসর্গ। সামনে বড় একটা পাহাড়ের চূড়া দেখিয়ে অপনেশবাবু বললেন, "ওই দ্যাখো কুম্ভিলা পিক আর ওই দ্যাখো কুসুম কাংরু। মেঘটা যদি পুরো কেটে যেত, এখান থেকেই আমার প্রথম এভারেস্টের দর্শন পেয়ে যেতাম। তাই না শেরবাহাদুর?"

শেরবাহাদুর সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। এভাবে ট্রেকিং করতে-করতে কয়েক ঘণ্টা ধরে, ওরা দুধকোশী নদীর উপর বিশাল লম্বা একটা লোহার ঝুলন্ত ব্রিজের সামনে এসে পড়ল। যদিও ব্রিজটার দু' দিকে লম্বা লোহার জালের বেড়া দেওয়া আছে, তাতে ঝোলানো আছে নানা রঙের পতাকা। তবুও ব্রিজটা পেরোতে বেশ ভয়-ভয়ই করছিল টুবলুর। ব্রিজটা পেরিয়ে যে জায়গাটায় ওরা এল, সেই জায়গাটার নাম ফাকদিং। জায়গাটার নাম টুবলুর আগেই জানা ছিল, আজকের গন্তব্যস্থল। বেশ বাড়িঘর, দোকানপাট আছে জায়গাটায়। অপনেশবাবু ট্রাভেল এজেন্টকে দিয়ে আগেই হোটেল বুক করিয়ে রেখেছিলেন। এখানে অবশ্য ঘরগুলো কাঠমন্ডুর মতো বড়-বড় ছিল না। তিনটে ঘর বুক করেছিলেন

অপনেশবাবু। তার মধ্যে টুবলুর একটা। খাওয়াদাওয়ার পর ঘরে গিয়ে খাটে শুয়ে ট্রেকিং করার ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল টুবলু।

দরজায় টকটক শব্দে ঘুম ভাঙল টুবলুর। দরজা খুলে দেখল, বাইরে অপনেশবাবু আর অনুজা। তাঁদের পিছনে শেরবাহাদুর। তিনজনের মুখই খুব উদ্বিগ্ন। টুবলু ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

অনুজা ঘরের ভিতর ঢুকে এসে বলল, "তোর শরীর ঠিক আছে টুবলু?"

"হ্যাঁ, কেন?"

"উফ বাঁচালি। ক'টা বাজে জানিস?"

"ক'টা?"

"সওয়া সাতটা। দরজা লক করে শুয়েছিলি। ভীষণ টেনশন হয়ে গিয়েছিল। মোবাইলেও পাচ্ছিলাম না।"

দরজার নকে ঘুম ভাঙেনি, মোবাইলের রিং টোনেও ঘুম ভাঙেনি, এত গাঢ় ঘুমিয়ে গিয়েছিল। টুবলু লজ্জা পেল। দেখল, শেরবাহাদুর উদ্বিগ্নতা কাটিয়ে মিটিমিটি হাসতে শুরু করে দিয়েছে। অপনেশনবাবু টুবলুর লজ্জাটা সহজ করে দিতে বললেন, "এখানে বিকেলের রোদে হিমালয়টা দেখা মিস করে গেলি টুবলু। নেভার মাইন্ড। ফেরার পথে আর একবার দেখার চান্স পাবি। অনু, তুই দ্যাখ ও কী খাবে?"

"মোমো বলে দিচ্ছি। বিকেলে খেয়েছি, দারুণ টেস্ট।"

অপনেশবাবু আর শেরবাহাদুর চলে গেলেন। অনুজা যেন ওদের চলে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। বলল, "তুই আবার তোর দাদাইকে বলিস কুম্ভকর্ণ! নিজে কী? বাবা টেনশন করছিলেন। আমি তো বুঝতেই পারছিলাম, টায়ার্ড হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলি। শোন না, অর্ণব আর একটা সর্বনাশ করেছে।"

"আবার কী সর্বনাশ করল দাদাই?" চোখ থেকে ঘুম ছুটিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"আর বলিস না। ও আর একবার ব্লগ লেখার লোভ সামলাতে পারেনি। আনসান লিখে আলেকজান্ডারকে আরও কনভিন্স করে ফেলেছে যে, ক্যামেরাটার সন্ধানে বাবা নামচেবাজারে যাচ্ছেন।"

টুবলু চোখ কচলে নড়েচড়ে বসল, "তুমি কী করে জানলে?"

"বিকেলে আই প্যাডে আবার ব্লগটা খুলেছিলাম। দেখলাম, অর্ণব লিখেছে, 'অবশেষে আমি বাজিটা জিতে গেলাম আলেকজান্ডার। মাত্র দশ মিনিট আগে ক্যামেরাটা শেষ পর্যন্ত আমার এজেন্টের হাতে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু চ্যালেঞ্জটা আমি জিতে গেলেও আসল প্রমাণটা বোধ হয় করতে পারব না। আমার এজেন্ট আমাকে জানিয়েছে ক্যামেরার পিছনের ঢাকনিটা ভাঙা।

অর্থাৎ ভিতরের ফিল্ম রোলটা এক্সপোজ করে গিয়েছে। সুতরাং চলো, আমরা সব ভুলে যাই...' এই সব লিখতে-লিখতে এমন গোরু রচনা লিখে বসেছে যে, পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে অর্ণব প্রাণপণে কিছু লুকোতে চাইছে। তার উত্তরে আলেকজান্ডার ব্লগে লিখেছেন, এজেন্টের কথাটা যে আর একটা মিথ্যা উনি বুঝতে পেরেছেন। বোল্ড ফন্টে আন্ডারলাইন করে লিখেছেন ক্যামেরা আর ফিল্ম রোলটা কোথায় আছে তার নির্দিষ্ট সন্ধান উনি পেয়ে গিয়েছেন। আর সেই জায়গাটার থেকে খুব দূরে নেই উনি।"

টুবলু চিন্তিত হয়ে বলল, "তা হলে?"

"চিন্তার এখানেই শেষ নয় রে টুবলু। আর একটা তথ্য পাওয়া গিয়েছে। আলেকজান্ডার একা আসছেন না। ওঁর সঙ্গে আসছেন আরও অন্তত চারজন।"

শুকনো গলায় টুবলু বলল, "সেটার আন্দাজ তো জেঠু দিয়েছিলেন। কিন্তু আলেকজান্ডারের সঙ্গে কারা আসছেন?"

"ব্লগে এক জায়গায় চার্লি উমেশকে লিখেছে, বিগ বসের টিমকে রিসিভ করতে কাল সকালে লুকলা এয়ারপোর্টে রমেশকে নিয়ে থাকতে। আমাদের শুধু একটাই অ্যাডভান্টেজ আছে, ওদের টিমটা কিছুতেই আমাদের আগে নামচেবাজার পৌঁছতে পারবে না।"

"তুমি কী করে এত শিওর হচ্ছ অনুজাদিদি?"

"বললাম না কাল ওঁরা লুকলা আসছেন। মানে, কাল বিকেলে এখানে। পরশু দুপুরের আগে ওঁরা নামচেবাজার পৌঁছতেই পারবেন না।"

টুবলু তর্ক করল, "কিন্তু যদি ধরো, ওঁরা যদি একদিনেই লুকলা থেকে হেঁটে নামচেবাজার চলে যান?"

"সেক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে আছি। কাল যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, আমরা নামচেবাজার যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ব এবং পৌঁছে গিয়ে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আমাদের কাজ শুরু করে দেব। শুধু বাবাকে আর কিছু বলব না। এক্সাইটেড হয়ে গিয়ে কাল অতটা ট্রেকিং করা বাবার উচিত হবে না।"

॥ ৮ ॥

সকালে তাড়াতাড়িই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল টুবলুর। প্রথমে মনে হয়েছিল, ভোর। কিন্তু পরে ঘড়িতে দেখল সাড়ে ছ'টা বাজে। আসলে বাইরে খুব মেঘ করে ছিল। তাই রোদ্দুর ঢেকে ছিল। নামচেবাজার যাওয়ার জন্য আজ যে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে, সেটা মাথায় ছিল টুবলুর। আর তাতেই ঘুমের রেশটা চোখ থেকে একেবারে উবে গেল।

সাড়ে সাতটার মধ্যে রেডি হয়ে সকলে বেরিয়ে পড়ল। গতকালের চেয়ে আজ অল্পই বেশি রাস্তা। এগারো কিলোমিটার। অল্প হাঁটার পরে রাস্তাটা চড়াই হতে শুরু করল। কালকের চেয়ে রাস্তাটা অন্যরকম। দুধকোশী নদী, ছোট-ছোট পিকচার পোস্টকার্ডের মতো গ্রাম, সবুজ জঙ্গল, পাখির ডাক, প্রকৃতির উজাড় করে দেওয়া এই রাস্তায় মুগ্ধতা ক্লান্তিকে আসতে দিচ্ছে না। নামচেবাজারের দিকে যত এগোচ্ছে, টুবলুর তত যেন ভিতরে-ভিতরে বিশ্বাসটা ঘন হচ্ছে যে, ম্যালোরির ক্যামেরাটা পাওয়া যাবেই। সেই সঙ্গে আর-একটা চ্যালেঞ্জ, আলেকজান্ডারও চলেছেন একই জিনিসের খোঁজ করতে। এই রাস্তায় মাঝে-মাঝেই বৌদ্ধ স্তূপ বা চোর্তেন পড়ে। টুবলু তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মনে-মনে প্রার্থনা করছে, ঠিক যেন খুঁজে পেয়ে যায় অত্যন্ত দুর্মূল্য ক্যামেরাটা। রাস্তায় কোনও বিদেশি ট্রেকার হাঁটার গতি বাড়িয়ে টুবলুদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলে টুবলুর কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, এই যেন আলেকজান্ডার এগিয়ে গেলেন ক্যামেরাটার খোঁজে। সঙ্গে-সঙ্গে টুবলু অনুজার কনুইটা টেনে নিজের হাঁটার গতিটাও বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

এই পথে দুধকোশী নদীটা বেশ কয়েকবার পেরোতে হয় ব্রিজ দিয়ে। একবার এক সাহেবকে আলেকজান্ডার ভেবে তাড়া করতে গিয়ে ব্রিজের উপরে পা রাখতেই পিছন থেকে খপ করে ওর হাতটা টেনে ধরল শেরবাহাদুর। কারণ, সরু ব্রিজটার ওপ্রান্তে তখন একদল ইয়াক উঠে পড়েছে। পাশাপাশি পেরোতে গেলে ইয়াকগুলোর শিঙের গুঁতো খাওয়ার প্রবল আশঙ্কা। তবে নামচেবাজার পৌঁছনোর শেষ পথটুকুতে একমাত্র শেরবাহাদুর ছাড়া সকলে হাঁফিয়ে উঠলেন। মধ্যিখানে একটা অংশে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খুব চড়াই পথ ছিল। সেটুকু পেরোতে একেবারে যেন বেদম করে দিয়েছিল। এক জায়গায় একটা বিশাল পাথরের সামনে এসে দাঁড়ালেন ওরা। পাথরটা নীল রং করা। আর তাতে অজানা হরফে কী যেন লেখা আছে। অপনেশবাবু বললেন, "এটা হল এই পথের বিখ্যাত মণি ওয়াল। ওখানে লেখা বৌদ্ধ মন্ত্র 'ওঁ মণিপদ্মে হুম'।"

শেরবাহাদুর বলল, "এই পাথরকে ডান দিকে রেখে

যেতে হয়, তা হলে যাত্রাপথ শুভ হয়। মনস্কামনা পূর্ণ হয়।”

সেইমতো ভক্তিভরে পাথরটাকে প্রণাম করে বাকি রাস্তাটুকু থেমে-থেমে পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত নামচেবাজারে এসে পৌঁছল টুবলুরা, তখন বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে।

তবে নামচেবাজারে এসে একটু দমে গেল অনুজা আর টুবলু। যেটুকু স্লাইডের ফোটোতে দেখেছিল, তাতে মনে হয়েছিল নামচেবাজার খুব একটা বড় জায়গা নয়। ফোটোতে দেখেছিল, ওখানে বাড়িগুলো সব নীল বা সবুজ চালের। অনেক বাড়ি নিয়ে একটা গ্রাম। আদপে এসে দেখল, নামচেবাজার একটা বেশ জনবহুল জায়গা। গ্রামটা ঘোড়ার নালের মতো। নামচেবাজারে প্রচুর দোকান, হোটেল। এখানে কোনও হোটেল আগের থেকে বুক করে রাখেননি অপনেশবাবু। তাতে অবশ্য কোনও অসুবিধে হল না। প্রচুর টুরিস্ট থাকলেও একটা হোটেল পছন্দ করে জায়গা পেয়ে গেলেন অপনেশবাবু। তবে এই হোটেল খোঁজার প্রক্রিয়াটায় টুবলু আর অনুজার ভিতরের আত্মবিশ্বাসটা একেবারে নড়ে গেল। নামচেবাজারের ভিতর থিকথিকে ভিড়। স্থানীয় লোকজনের চেয়ে বিদেশি টুরিস্ট বেশি। তাদের জন্য অসংখ্য দোকান, তার হরেক পসরা। স্লাইডের ফোটোয় যেরকম দোকানের ভিতর জিনিসপত্তর দেখেছে, সেরকম জিনিসপত্তর প্রায় সব দোকানেই পাওয়া যায়।

হোটেলে অল্প ফ্রেশ হয়ে নিয়ে খাওয়াদাওয়া সেরেই অপনেশবাবু ঠিক করলেন কাজে নেমে পড়বেন। এদিকে অনুজা যে প্ল্যান করেছে, সেটা অপনেশবাবুকে বলেনি। তাই অপনেশবাবুর প্ল্যানটাই আগে শুনল।

“আমার যুক্তিটা হচ্ছে লোকাল স্লাইড তুলে যে টুরিস্টদের কাছে বিক্রি করে, সে একজন ফোটোগ্রাফার। এভারেস্টের সঙ্গে-সঙ্গে এত হিমালয়ের চূড়া আর অনন্য প্রকৃতির মাঝে সে কয়েকটা নামচেবাজারের জনজীবনের স্লাইডও তুলেছে। তার মধ্যে একটা দোকানের ভিতরের ফোটো। খুব স্বাভাবিক ভাবেই একশো শতাংশ মানুষ এক্ষেত্রে নিজের দোকানের ভিতরের ফোটো তুলবে। সুতরাং আমাদের আগে খুঁজে বের করতে হবে স্টুডিও কাম সুভেনির শপ। লোকটার স্টুডিও থাকার সম্ভাবনাটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে দোকানের মধ্যে কোডাক ক্যামেরাটা থাকার সূত্রটা। একজন ফোটোগ্রাফার স্টুডিও মালিকেরই শখ থাকবে ক্যামেরা সংগ্রহ করার।”

টুবলু শুনছিল আজকাল ফিল্ম রোল প্রায় উঠেই যাচ্ছে। তার জায়গায় এসেছে মেমারি চিপ, ডিজিটাল ক্যামেরা। সেসব দেদার বিক্রি হতে দেখেছে ঘুপচি-ঘুপচি দোকানগুলোয়। টুবলুর মনের কথাটা অনুজা যেন শুনে ফেলে বলল, “কিন্তু বাবা, দেখলে তো সেরকম দোকান...।”

“রাইট। ফিল্ম রোল দিয়ে এখন আর দোকান আইডেন্টিফাই করা যাবে না। আমাদের খোঁজ করতে হবে ২০০৪ সালে স্টুডিও টাইপের কোন-কোন দোকান ছিল। আর সেই খোঁজটা শুরু করব, শেরবাহাদুর যে দোকানটা থেকে স্লাইডগুলো কিনেছিল সেখান থেকে।”

অনুজা বলল, “আমার মনে হয়, আমাদের হাতে সময় যেহেতু কম বাবা। তাই আমরা দু’টো টিমে ভাগ হয়ে গিয়ে খোঁজ করি। তুমি বাহাদুরচাচার সঙ্গে খোঁজো আর আমি টুবলুর সঙ্গে।”

অপনেশবাবু আপত্তি করলেন না। বরং খুশিই হলেন। টুবলু জানে এবার অনুজাদিদি নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে ম্যাপিং করে দোকানটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে।

চারজনেই হোটেল থেকে বেরিয়ে দু’ দলে ভাগ হয়ে গেল। অপনেশবাবু শেরবাহাদুরের সঙ্গে এগিয়ে গেলেন শেরবাহাদুরের স্লাইড কেনার দোকানটার দিকে। কিন্তু অন্য দিকে নিজেদের মতো বেরিয়েই ধন্দে পড়ল টুবলুরা। আকাশটা এমন মেঘে ঢাকা যে, অনুজার আই প্যাডে তুলে রাখা স্লাইডের ফোটোগুলোর সঙ্গে বাইরের প্রকৃতিতে হিমালয়ের চূড়াগুলো মিলিয়ে নেওয়ার উপায়টা কিছুতেই করা যাচ্ছিল না। অনুজা নিজের আই প্যাডের স্ক্রিনে বারবার ফোটোগুলো দেখতে-দেখতে আশপাশের কোনও কিছুর সঙ্গে হাজার চেষ্টা করেও মেলাতে পারছিল না।

একটা সময় রীতিমতো হাল ছেড়ে দিল টুবলু আর অনুজা। টুবলু আক্ষেপ করে বলল, “আগে আসার অ্যাডভান্টেজটা নেওয়া গেল না। আলেকজান্ডার দলবল নিয়ে ঠিক এসে পৌঁছে যাবেন। চলো, যতক্ষণ না আকাশটা পরিষ্কার হচ্ছে আমরা এমনিই এক-একটা দোকানে খোঁজ করি।”

“তাই চল,” এ ছাড়া এই মুহূর্তে আর কোনও উপায় না পেয়ে অনুজা বলল।

একটার পর-একটা দোকানে পুরনো ক্যামেরার খোঁজ করতে থাকল অনুজা আর টুবলু। কয়েকজন দোকানদার তো বলেই দিল যে, আরও দু’জন একটু আগেই পুরনো ক্যামেরার খোঁজ করছিল। টুবলু বুঝতে পারল সেই

দু'জন অপনেশবাবু আর শেরবাহাদুর না হয়ে যান না। তবে চমকে উঠল একটা দোকানে।

দোকানদার ছেলেটা অল্পবয়সি। অনুজার কাছে ক্যামেরার বর্ণনাটা শুনে ইংরেজিতে অনুজাকে জিজ্ঞেস করল, "ম্যাডাম, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? যে ক্যামেরাটার খোঁজ করছেন আপনারা, ওটা কি স্পেশ্যাল কিছু?"

অনুজা ব্যাপারটা চেপে গিয়ে বলল, "হ্যাঁ অ্যান্টিক। আমার এক বন্ধু এখান থেকে একটা কিনে নিয়ে গিয়েছিল। তাই আমারও খুব শখ হয়েছিল, এখান থেকে ওরকম একটা ক্যামেরা কিনে নিয়ে যাব।"

"আজও দেখছি সবাই ওটা খোঁজ করছে।"

"সবাই মানে?" অনুজা চাপা শ্বাসে প্রশ্ন করল।

"একটু আগে একজন নেপালি আর ইন্ডিয়ান এসেছিলেন, তার পরেই কয়েকজন সাহেব।"

অনুজা টুবলুর মুখের দিকে তাকাল। তারপর নিজের মোবাইলে অপনেশবাবুর একটা ফোটো বের করে দেখিয়ে বলল, "ইনি কি?"

দোকানদার ফোটোটা দেখে বলল, "হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনি চেনেন ওঁকে?"

অপনেশবাবু যে শেরবাহাদুরকে নিয়ে দোকানে দোকানে একই জিনিসের খোঁজ করছেন, সেটা জানা ছিল। কিন্তু চিন্তায় ফেলল দোকানদারের আর-একটা কথা। ক'জন সাহেবও ক্যামেরাটার খোঁজ চালাচ্ছে। তা হলে আলেকজান্ডারও পৌঁছে গিয়েছেন দলবল নিয়ে? ওঁরাও নেমে পড়েছেন ক্যামেরাটার খোঁজে? টুবলুর মনেও একই প্রশ্ন। টুবলুই জিজ্ঞেস করল, "আর যারা ছিলেন, তাঁরা ক'জন?"

"গুনে তো দেখিনি। তবে বেশ কয়েকজন।"

"সবাই সাহেব?"

"সাহেবও ছিলেন, দু'জন বোধ হয় আপনাদের দেশের লোকও ছিলেন।"

টুবলু নিচু গলায় বলল, "আমাদের দেশের লোক মানে বুঝতেই পারছ? রমেশ আর উমেশ। আলেকজান্ডার চার্লি, হ্যারি, অস্কার, ওয়াটসনদের মধ্যে কতজনকে নিয়ে এসেছে কে জানে!"

টুবলুর কথা শুনতে-শুনতেই অনুজা খেয়াল করল দোকানদার ছেলেটা তীক্ষ্ণ চোখে ওদের দেখছে, ওদের কথা শোনার চেষ্টা করছে। দোকানদার ছেলেটা এখন খুব ইম্পর্ট্যান্ট। কারণ, একমাত্র ও-ই আলেকজান্ডারদের দেখেছে। ম্যালোরির ক্যামেরাটা যদি থেকে থাকে, তা হলে আলেকজান্ডারদের দলটাকে চিনে নেওয়া যেরকম জরুরি, ক্যামেরাটা ওঁদের হাতে যাতে না যায়, সেটাও সেরকমই জরুরি। তাই সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে দোকানদার ছেলেটাকে হাতে রাখা এবং হাতে রাখতে গেলে ওকে খুশি রাখা দরকার। দোকানটায় ফোটোগ্রাফির হরেক জিনিস ছাড়াও অন্য জিনিসও পাওয়া যায়। অনুজা প্রথমে একটা লোকাল গাইড বুক কিনল, কিছু পিকচার পোস্টকার্ড কিনল। তারপর একটা ফোটো ফ্রেমের দিকে তাকিয়ে বলল, "বাঃ! খুব সুন্দর তো ফোটো ফ্রেমটা। এতক্ষণ চোখে পড়েনি। কত দাম?"

দোকানদার ছেলেটা ফোটো ফ্রেমটা পেড়ে অনুজার হাতে দিয়ে বলল, "নিন না ম্যাডাম। অনলি টোয়েন্টি ডলার, আপনি ইচ্ছে করলে ইন্ডিয়ান রুপিতেও দিতে পারেন। নিয়ে নিন। এরকম দু'টো পিস নেই।"

অনুজা ছেলেটার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার একটা বুদ্ধি পেয়ে গেল। বলল, "যাঃ! একটাই পিস আছে। কিন্তু আমাকে যে গিফ্‌ট দিতে হবে। দু' বোনকে। যমজ বোন। দু'টো একইরকম চাই। আর-একটা জোগাড় করে দিতে পারবে না? আমরা না হয় কাল সকালে আসব।"

"ঠিক আছে ম্যাডাম। যদি এরকম না পাই, এর চেয়েও ভাল দু'টো এক রকমের ফ্রেম এনে রাখব কাল সকালে।"

অনুজা একটু অভিনয় করে বলল, "ইস! এরকমই যদি কাল পুরনো কোডাক ক্যামেরাটা এনে দিতে পারতে। এত আশা করেছিলাম যে, ঠিক পেয়ে যাব। অন্য কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পার?"

"ক্যামেরার শখ তো আপনার। একেবারে লেটেস্ট মডেলের একটা ক্যামেরা দেখিয়ে দিচ্ছি। ইন্ডিয়াতে পাবেন না।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ভাই। আসলে আমার পুরনো দিনের ক্যামেরা জমানোর শখ। আমার বন্ধু বলেছিল নামচেবাজারে পুরনো ক্যামেরা পাওয়া যায়। শুধু ফোটো ফ্রেম কেন, অন্য সব গিফ্‌ট আইটেম মনে হচ্ছে তোমার দোকানেই পেয়ে যাব। কিন্তু পুরনো ক্যামেরা কোথায় পাই বলো তো?"

দোকানদার ছেলেটা আরও খুশি হল। বলল, "এই প্রেম থাকতে আপনাদের কোনও চিন্তা নেই। কাল আসবেন তো? আমি আপনাকে একজনের কাছে নিয়ে যাব। তার কাছে অনেক পুরনো ক্যামেরা আছে। আপনি বেছে নেবেন।"

"কাল কেন? আজই চলো না।"

"আজ রাত হয়ে গিয়েছে। কাল সকালে আসুন। কাছেই এক জায়গায় আপনাদের নিয়ে যাব।"

"কার কাছে?"

"এক বৃদ্ধ শেরপার কাছে। ও যে সাগরমাথার পথ থেকে কত কিছু কুড়িয়ে এনেছে। তার মধ্যে পুরনো ক্যামেরাও আছে। একবার দেখেছিলাম।"

"ওর দোকান আছে?"

"ছিল। বয়স হয়েছিল। অর্ধেক সময় দোকানই খুলত না। বেশ কয়েক বছর আগে দোকানটা বিক্রি করে দিয়েছে। তবে দোকানের অনেক বিক্রি না হওয়া জিনিস ওর বাড়িতেই পড়ে আছে।"

টুবলু আর অনুজা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। দু'জনেরই চোখ চকচক করে উঠল।

॥ ৯ ॥

নামচেবাজারে রাত একটু বাড়লেই দ্রুত ফাঁকা হতে শুরু করে। আলেকজান্ডার দলবল নিয়ে এই ছোট্ট জায়গায় এসে পৌঁছে গিয়েছেন। এটা ভাবতেই অনুজা আর টুবলুর উত্তেজনা হচ্ছিল। প্রেমের দোকান থেকে বেরিয়ে হোটেলের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে দু'জনের খিদে পেয়ে গিয়েছিল। রাস্তার ধারে একটা কাফে গোছের জয়েন্ট দেখা যেতেই খিদেটা যেন বেড়ে গেল। অনুজা বলল, "চল টুবলু, একটু বসে কিছু খেয়ে নিই।"

গরম নুড্‌ল সুপের অর্ডার দিয়ে অনুজা বলল, "টুবলু, আমরা যা খোঁজ পেয়েছি, তা কিন্তু বাবাকে এখনও কিচ্ছু বলিস না। এক্সাইটেড হয়ে যাবেন।"

"তা হলে আমরা জেঠুকে গিয়ে কী বলব?"

"বলব যে আমরা খোঁজ করছি, কিন্তু কিছু পাচ্ছি না। কাল আরও খোঁজ করব।"

"ভাবছি, আলেকজান্ডার যখন পৌঁছে গিয়েছেন, কিছু একটা করা দরকার। দাদাইকে বল আরও কনফিউজ করে দিতে?"

"আবার তোর দাদাই?"

"এবার কী লিখবে আমরা বলে দেব। আমরা বলব, ম্যালোরির ক্যামেরাটা আমরা পেয়ে গিয়েছি। কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। নেক্সট উইকে প্রেস কনফারেন্স করে গোটা পৃথিবীতে এই আবিষ্কারটা জানিয়ে দেব। আর নিশ্চিন্ত করতে বলব, ক্যামেরার ভিতর যে ফিল্ম রোলটা আছে সেটা আমরা একটা স্টুডিওর ডার্করুমের ভিতর গিয়ে দেখে নিয়েছি।"

"তোর দাদাই অলরেডি এজেন্ট-ফেজেন্ট লিখে বসে আছে। তারপর বলেছে ঢাকনিটা ভাঙা। এর পর আবার লিখবে ডার্করুমে গিয়ে ফিল্ম রোলটা ঠিকঠাক আছে দেখেছে। লোকটা কনফিউজড হওয়ার চেয়ে আরও বেশি করে কনভিন্সড হয়ে যাবে আমরা আপ্রাণ কী করতে চাইছি। তা ছাড়া লোকটাও নিশ্চয়ই আমাদের মতো খবর পাচ্ছে যে, আমরা ক্যামেরাটা খুঁজছি।"

"তাই দাদাইকে দিয়েই প্রমাণ করাতে হবে ক্যামেরাটা আমরা অলরেডি পেয়ে গিয়েছি।"

"আচ্ছা বল, তোর দাদাই কী করবে?"

"শোনো, আমি বললে দাদাই পাত্তাই দেবে না। তুমি দাদাইকে একটা কাজ করে দিতে বলো। দাদাই কম্পিউটার গ্রাফিক্সে মাস্টার। দাদাইকে বলো কোডাক ভেস্টপকেট ক্যামেরার যে ফোটোটা দাদাইয়ের কাছে আছে, সেটা যদি কায়দা করে, কারও একটা মুখ না দেখিয়ে হাতে ধরানো আছে দেখাতে পারে, আলেকজান্ডার এটা বিশ্বাস করবেনই যে, ক্যামেরাটা এখন আমাদের হস্তগত।"

অনুজার এই আইডিয়াটা মন্দ মনে হল না। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী? অনুজা মোবাইলে অর্ণবকে ধরতেই টুবলু ফিক করে হেসে ফেলে বলল, "তুমি দাদাইয়ের সঙ্গে কথা বলো, আমি একটু সামনের দোকানটা থেকে চিউয়িং গাম কিনে আসছি।"

অনুজা ফোনে অর্ণবকে ধরল, "হ্যালো অর্ণব? ব্যস্ত আছ নাকি? কথা বলা যাবে?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ বলো, কেমন ঘুরছ তোমরা?"

"বেড়াতে তো আসিনি, শোনো একটা খুব আর্জেন্ট কাজ আছে। তোমার কাছে ভেস্টপকেট ক্যামেরার ফোটোটা আছে?"

"আছে।"

"আমাদের একটা খুব রিয়্যালিস্টিক ফোটো দরকার। একজনের হাতে এই ক্যামেরাটা থাকবে। যাতে প্রমাণ হয় যার হাতে ক্যামেরাটা আছে, সে সত্যিই ম্যালোরির ক্যামেরাটা পেয়ে গিয়েছে। এরকম একটা ফোটো তৈরি করে বাবার ব্লগে আপলোড করে দিতে হবে।"

"ওহ! এই ব্যাপার। এ তো আমার বাঁ হাতের পাঁচ মিনিটের খেল। কিন্তু তুমি রিয়ালিস্টিক ফোটো চাইছ তো? এক কাজ করো। তোমার আই প্যাডে যেসব ফোটো তুলেছ, তার দু'-একটা আমাকে ই-মেল করে পাঠিয়ে দাও। ব্যাকগ্রাউন্ডে তোমার তোলা ফোটোটা থাকলে জায়গাটা নামচেবাজার বলে এস্টাবলিশ করতে সুবিধে হবে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা মানে তোমাদের

নামচেবাজারে ক্যামেরাটা খুঁজে পাওয়ার কিছু হল?”

অনুজা ব্যাপারটা ভাঙল না। কারণ, অর্ণবকে বিশ্বাস নেই। হয়তো কথা বলতে গিয়ে মুখ ফসকে বাবাকে কিছু বলে ফেলতে পারে বা ব্লগে দুম করে কিছু লিখে ফেলতে পারে। অল্প ব্যস্ততা দেখিয়ে বলল, “পরে সব বলছি। আপাতত ছবিটা যত তাড়াতাড়ি পার, আপলোড করে বাবার নামে একটা সুটেবল পোস্ট লিখে দাও। আর কাজটা হয়ে গেলে আমাকে একটা টেক্সট করে দিও। আর বাবাকে এখন কিছু বোলো না প্লিজ।”

ফোনটা ছেড়ে অনুজা ব্যাগ থেকে আই প্যাডটা বের করে অর্ণবের কথামতো কয়েকটা ফোটো চটপট ই-মেলে অ্যাটাচ করে পাঠিয়ে দিল। তারপর টুবলুকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলল, “বলেছি, এবার তোর দাদাই সব ঠিকঠাক করলে হয়।”

“দাদাই এসব ব্যাপারে মাস্টার। কিন্তু অনুজাদিদি, চিউয়িং গাম কিনতে গিয়ে অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখলাম। প্রেম একটা সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিল।”

“এতে আশ্চর্যের কী আছে। প্রেম তো টুরিস্টদের সঙ্গে ব্যবসা করার চেষ্টা করবেই।”

“তা নয়। সন্দেহজনক হল, প্রেম লোকটার সঙ্গে একেবারে নিচু গলায় কথা বলছিল। আমার দিকে চোখ পড়তেই বারবার আড়চোখে তাকাচ্ছিল। তারপর সাহেবটাকে নিয়ে লম্বা পায়ে অন্য দিকে চলে গেল।”

দম বন্ধ করে অনুজা বলল, “তুই সাহেবটার মুখ দেখেছিস?”

“নাঃ! সাহেবটা পিছন দিকে মুখ করেছিল। আমি দেখার চেষ্টা করতেই প্রেম চলে গেল।”

“প্রেমকে খুঁজে পাবি কোথায়?”

“এদিক-ওদিক পেয়ে যাব ঠিকই। আমি ওর জ্যাকেটটা চিনে রেখেছি। পিঠে লেখা আছে ‘ই ফর এভারেস্ট’। পিছন দিক থেকে দেখলেও চিনতে পারব।”

“প্রেম মনে হয় একই জিনিসের জন্য দু’জন খদ্দের পেয়ে গিয়ে এবার খেলবে। খুঁজে লাভ নেই। ‘ই ফর এভারেস্ট’, ‘এল ফর লোৎসে’ এরকম জ্যাকেটের পিঠে লেখা লোক তুই শ’য়ে-শ’য়ে পাবি। চল, এবার হোটেলে ফিরি। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে।”

দশ মিনিটের মধ্যে হোটেলে ফিরে এল ওরা। ফিরে এসে দেখল হোটেলের লবিতে বসে অপনেশবাবু আর শেরবাহাদুর কিছু নিয়ে গভীর আলোচনা করছেন। নিজেদের অভিজ্ঞতাটা লুকিয়ে অনুজা জিজ্ঞেস করল, “কিছু এগোতে পারলে বাবা?”

অপনেশবাবু বললেন, “কী যে আফশোস হচ্ছে, তোদের বলে বোঝাতে পারব না। শেরবাহাদুরের চেষ্টায় আমরা সেই দোকানটা খুঁজে পেয়েছি। দোকানটার ফোটোর প্রিন্ট আউট দেখেই ক্যামেরাটা চিনতে পারল। ওটা নাকি কুড়ি বছর ধরে ওর দোকানে পড়ে ছিল।”

“তারপর?” রুদ্ধশ্বাসে অনুজা আর টুবলু বলে উঠল।

“বছর দুয়েক আগে ওর দোকান থেকে নাকি ক্যামেরাটা চুরি হয়ে যায়।”

“দু’ বছর আগে?” টুবলুর গলাটা চড়ে গেল, “তা হলে তো মিলে যাচ্ছে। ড্যানিয়েল ব্লগে লিখেছিলেন, ওঁদের দেশের মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন থেকে ও খবর পেয়েছিল ওঁদের দেশের এক সাহেব নামচেবাজারের রাস্তার ধারে ক্যামেরাটা দেখে খুব আশ্চর্য হয়েছিলেন।”

“নাঃ! ড্যানিয়েলের লোকটার কথায়ও ফাঁক আছে,” অপনেশবাবু বললেন, “যে জায়গায় চুরি হয়েছে, সেই জায়গায়ই রাস্তায় দিনেদুপুরে সেটা বিক্রির জন্য পড়ে থাকবে, এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। তা ছাড়া আমি একা নই, আলেকজান্ডারের মতো পর্বতপ্রেমীও ক্যামেরাটা পাওয়া যেতে পারে বিশ্বাস না করলে তড়িঘড়ি নামচে চলে আসতেন না।”

“তার মানে ক্যামেরাটা নামচেবাজারেই এখনও আছে?” টুবলু জিজ্ঞেস করল।

“থাকার সম্ভাবনা প্রবল। কারণ, আমি দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে যেটুকু জেনেছি, দোকানে অনেক কিছু টুকিটাকি জিনিসের মধ্যে ক্যামেরাটাও চুরি গিয়েছিল। চোর নেহাতই ছিঁচকে চোর। আমার বিশ্বাস জিনিসটা এখনও এই নামচেবাজারেই আছে। যে জিনিসটা দোকানের ডিসপ্লে-তে থেকে বিক্রি হয়নি, চোর সেটা সহজে বিক্রি করে দিতে পারবে না। আবার জিনিসটা চোরাই, তাই কোনও দোকানেও বিক্রি করতে পারবে না।”

শেরবাহাদুর মাথা নাড়িয়ে-নাড়িয়ে শুনছিল। অপনেশবাবু দম নিতে শেরবাহাদুর বলতে শুরু করল, “কাল বড় সাহেবকে নিয়ে আমি আরও দু’-একটা জায়গায় যাব। চোরাই জিনিস যেখানে পাওয়া যায়।”

অপনেশবাবু চিন্তিত গলায় বললেন, “দুশ্চিন্তা শুধু একটাই। একই জিনিস খোঁজ করতে একই সময়ে আমরা আর আলেকজান্ডাররা একই জায়গায় এসে হাজির হয়েছি। উনি যদি আমাদের আগে জিনিসটা পেয়ে যান...।”

অপনেশবাবুকে ঠান্ডা করতে অনুজা বলল, "যদি পেয়ে যান যাবেন। আমরা আর আলেকজান্ডাররা তো আসলে একই উদ্দেশ্য নিয়ে ম্যালোরির ক্যামেরাটা খুঁজছি। তোমার ভয় আলেকজান্ডার ক্যামেরাটা খুঁজে পেলে সত্যিই কোনওদিন প্রকাশ না-ও করতে পারেন। ম্যালোরি এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে পেরেছিলেন এটা যেমন সত্যি হতে পারে, খুবই দুর্ভাগ্যজনক ভাবে উঠতে পারেননি, এটাও সেরকম সত্যি হতে পারে। ল' ইয়ার হয়ে তুমি সব সময় কী বলো বাবা? সত্য একদিন প্রকাশ হবেই। আমরা সেই আশাটা নিয়েই থাকি বাবা।"

॥ ১০ ॥

ডিনারের পর শেরবাহাদুর অপনেশবাবুকে বলল, "চলুন বড় সাহেব। বাইরে আকাশটা এখন পরিষ্কার আছে। চাঁদের আলোয় আপনাকে হিমালয় দেখিয়ে আনি।" অপনেশবাবু, অনুজা আর টুবলুকে জিজ্ঞেস করলেন, "যাবি নাকি?"

টুবলুর ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অনুজা ইশারায় বারণ করে দিল।

অপনেশবাবুরা বেরিয়ে যেতেই টুবলু অনুজাকে জিজ্ঞেস করল, "গেলে না কেন অনুজাদিদি? চাঁদের আলোয় বরফের চূড়া দেখতে দুর্দান্ত লাগত।"

"সে তুই-আমি পরে যেতেই পারি। কিন্তু আপাতত একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট কাজ আছে।"

"কী কাজ?"

"তোর দাদাইকে একটা ফোন করা।"

টুবলু মুখ টিপে হাসল, "ও, তুমি এখন ফোনে দাদাইয়ের সঙ্গে আড্ডা দেবে? তা হলে আমাকে আটকালে কেন?"

টুবলুর মাথায় আলতো করে চাঁটি মেরে অনুজা বলল, "ফাজিল ছেলে, এখন কি আড্ডা দেওয়ার সময়?"

"তা হলে?"

"তোর দাদাইকে আর-একটা টাস্ক দেব। প্রেমের দোকান থেকে যে টুরিস্ট গাইডটা কিনেছি, তাতে এখানকার সব ক'টা হোটেলের ফোন নম্বর আছে। তোর দাদাইকে অর্ধেক নম্বর দিয়ে দেব। ও ওই হোটেলগুলোতে ফোন করে জানতে থাকবে আলেকজান্ডার নামে কেউ চেক ইন করেছেন কিনা।

বাকি অর্ধেক হোটেলগুলোয় আমরা খোঁজ করব। লোকটাকে আইডেন্টিফাই করে ফেলা ভীষণ দরকার।”

“লাভ হবে কি অনুজাদিদি? লোকটার অ্যাকাউন্ট নেম হয়তো আলেকজান্ডার হতে পারেন কিন্তু আসল নাম হয়তো আলাদা।”

“মনে হয় না। ওঁর ঠিকানায় বাবা বই পাঠান। এখানে হোটেলওয়ালারা মাঝে-মাঝে পাসপোর্টের কপি রাখে। বাবা বলেছিলেন না, আলেকজান্ডার একবার এভারেস্টে উঠেছিলেন। চল, ওঁর ব্লগটা ভাল করে পড়ি। কিছু না-কিছু সূত্র নিশ্চয়ই পাব।”

অনুজা নিজের আই প্যাডে অপনেশবাবুর আই ডিতে লগ ইন করল এবং কিছু পড়ার আগেই বিস্ফারিত চোখে একটা ফোটো দেখে বলল, “দেখেছিস টুবলু, তোর দাদাইয়ের লেটেস্ট সর্বনাশটা। কী ফোটো আপলোড করেছে দ্যাখ!”

দাদাইয়ের সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। ফোটোটা দেখে টুবলুর প্রথমেই বেদম হাসি পেল। বেশ কয়েকটা ফোটোর লেয়ার সুপার ইমপোজ করেছে। কিন্তু সেটা করতে গিয়েই যথারীতি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ফোটোটায় ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্যবহার করেছে ওদের হোটেলের সামনে তোলা অনুজার ফোটোটা। পিছনে হিমালয়ের রেঞ্জটা বেশ ভাল দেখা যাচ্ছে। হাসির কারণ, সুপার ইমপোজ করা ফোটোটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লাল সোয়েটার আর মাঙ্কিক্যাপ পরা টুবলুদের বাড়ির ড্রাইভার রামশপথ। আর তার গলায় ঝুলছে, ১৯২৪ সালের মডেলের কোডাক ভেস্টপকেট ক্যামেরাটা।

“তুই হাসছিস কেন টুবলু?”

“রামশপথদাকে চিনতে পারছ?”

“ওমা, তাই তো! তোদের বাড়ির ড্রাইভার। তাই চেনা-চেনা লাগছে,” এবার ফিক করে হেসে ফেলল অনুজাও।

“কোনও মানে হয়? আলেকজান্ডার কেন, যে কেউ ধরে ফেলবে ফোটোটা ফেক। রামশপথদাকে দ্যাখ, আবার হাওয়াই চটি পরে আছে।”

“দাঁড়া, তোর দাদাইকে ফোন করে একটু বকুনি দিই। সর্বনাশ ছাড়া কিছু করতে পারে না।”

“ছাড়ো অনুজাদিদি। যা হয়ে গিয়েছে, এখন আর কিছু করার নেই। বরং দেখি এই ফোটোটার উত্তরে ব্লগে আলেকজান্ডার কিছু লিখেছেন কি না।”

ব্লগে আলেকজান্ডারের কোনও উত্তর নেই।

টুবলু বলল, “চলো, এবার আমরা আসল কাজটা করে নিই। ব্লগটা গোড়া থেকে পড়তে শুরু করি।”

খাটের হেডবোর্ডে বালিশ দিয়ে অনুজা আর টুবলু ঠেস দিয়ে বসে প্রথম থেকে ব্লগটার খুঁটিনাটি পড়তে শুরু করল। অপনেশবাবু যেমন বলেছিলেন, বছর চারেক আগে ব্লগটা শুরু করেছিলেন আলেকজান্ডার। তিনিই ব্লগটার মডারেটর। ব্লগটার শুরু হয়েছিল একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। ট্রেকার্সদের জন্য হিমালয়ে দূষণ বাড়ছে। এটা আটকানোর জন্যই নানান চিন্তাভাবনার কথা বলেছেন আলেকজান্ডার। গোটা ব্লগে সাম্প্রতিক কালের ঘটনার আগে ম্যালোরির ক্যামেরার কথাটা মাত্র একবারই উল্লেখ রয়েছে। যেখানে বছর দু’য়েক আগে ওয়াটসন লিখেছেন, ‘এভারেস্টের তলায় টন-টন আবর্জনার নীচে হয়তো চাপা পড়ে রয়েছে ম্যালোরির ক্যামেরার মতো অমূল্য কোহিনুর।’ আর তারপরেই রয়েছে দিন দশেক আগে লেখা অপনেশবাবুর সেই পোস্ট ‘নামচেবাজারে ম্যালোরির ক্যামেরাটা খুঁজে পাওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি।’ এর পরই অপনেশবাবু লিখে ফেলেছেন শেরবাহাদুরের স্লাইডের কথা, ফোটো আপলোড করেছেন। তারপর আলেকজান্ডারের নানা জিজ্ঞাসা। অস্কার, ড্যানিয়েলদের অবিশ্বাস করা। বেশ জমাটি তর্ক। তারপর নামচেবাজারে ক্যামেরাটা খুঁজতে না যাওয়ার জন্য আলেকজান্ডারকে অনুরোধ, স্লাইডের জন্য টাকা অফার ইত্যাদি।

বেশ অনেকক্ষণ লেগে গেল পুরো ব্লগটা পড়তে। আই প্যাডটা পাশে নামিয়ে রেখে অনুজা বলল, “কী বুঝলি?”

“বুঝলাম জেঠু যেমন বলেছিলেন, আলেকজান্ডার লোকটা আসলে এক নম্বরের ধান্দাবাজ। মুখে ওইসব পরিবেশ রক্ষার কথা বললেও আসল উদ্দেশ্য অন্য। দেখছ না যখন ম্যালোরির কথাটা প্রথম ওয়াটসন লিখেছিলেন, তখন একটাও কমেন্ট করেননি। কিন্তু যেই জেঠু লিখলেন অমনি খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।”

অনুজা বলল, “আমার কীরকম একটা খটকা লাগছে জানিস।”

“কিসের খটকা?”

“তুই যদি ব্লগটার প্রথম দিন থেকে দেখিস, দেখবি, ব্লগটায় যখন কোনও আলোচনা শুরু হয়েছে, লোকগুলো সব কাছাকাছি সময় উত্তর দিয়েছেন।”

“তাতে খটকা লাগার কী আছে?”

“দ্যাখ এই লোকগুলো সব এক-একটা দেশের লোক। ধর, আলেকজান্ডার যখন রাত এগারোটা দশে

ব্লগটা লেখেন, তার পনেরো মিনিটের মধ্যে সাউথ আফ্রিকা থেকে ড্যানিয়েল ওঁর মন্তব্য লিখছেন, তার দশ মিনিটের মধ্যে রাশিয়া থেকে ইয়েলেতসিন মন্তব্য লিখছেন। খটকা কোথায় বুঝেছিস? পৃথিবীর এক-একটা প্রান্তে ওঁদের দেশ। এক-একটা দেশের এক-একটা সময়। কোথাও যখন মাঝরাত্রি, অন্য কোথাও ভোর বা বিকেল। কারও অফিসে থাকার কথা, কারও ঘুমনোর কথা। সবাই এত তাড়াতাড়ি রেসপন্ড করেন কী করে?"

টুবলুকে ব্যাপারটা ভাবাল। হোটেলের প্যাডের এক টুকরো কাগজ নিয়ে প্রত্যেকের নাম লিখতে বসল প্রথম থেকে যাঁরা মেম্বার হয়েছেন। আলেকজান্ডার, চার্লি, হ্যারি, অস্কার, ওয়াটসন, ড্যানিয়েল, হিউয়েন, উমেশ, রমেশ, ইয়েলেতসিন, অপনেশ। তারপর কে কখন উত্তর দিয়েছেন, টাইমগুলো লিখতে বসল। তারপর হঠাৎ করে একটা আলোর দিশা যেন দেখতে পেল। তুড়ি মেরে বলে উঠল, "একটা সূত্র পাচ্ছি অনুজদিদি। চার্লি, হ্যারি, অস্কাররা এক-এক দেশের হতে পারেন; কিন্তু এরকমও তো হতে পারে, ওঁরা সবাই একই দেশে আছেন।"

"কোথায়?" দমবন্ধ উত্তেজনায় অনুজা বলে উঠল।

"দ্যাখো, জেঠুও আলেকজান্ডারের কাছাকাছি সময় উত্তর দিয়েছেন। সুতরাং জেঠুর সময়টা যদি স্ট্যান্ডার্ড ধরি, তা হলে বাকিরা কাছাকাছিই কোথাও.... ইন্ডিয়া বা নেপালে। জেঠু ফিরে এলেই ব্যাপারটা বলতে হবে।"

"না, তার আগে আর-একটা কাজ আছে। আলেকজান্ডারের সম্পর্কে আর-একটু খোঁজ করা। ইন্টারনেটে এভারেস্টে কারা-কারা উঠেছেন, তাঁদের নামের একটা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে। ওখান থেকে আলেকজান্ডার সম্পর্কে খোঁজ করি।"

ওয়েবসাইটটা সহজেই পাওয়া গেল। একেবারে হিলারি আর তেনজিং থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যাঁরা-যাঁরা এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছেন, প্রত্যেকের নাম নথিভুক্ত আছে। ১৯৯০ সালে আমেরিকার আলেকজান্ডার লোয়ে থেকে ব্রিটেনের আলেকজান্ডার অ্যালান, নরওয়ের আলেকজান্ডার গেম, নিউজিল্যান্ডের আলেকজান্ডার ওয়েন, রাশিয়ার আলেকজান্ডার আব্রাহাম, চিনের আলেকজান্ডার হিউ থেকে আরও কিছু আলেকজান্ডার এভারেস্টে আরোহীর নাম পেলেও আলেকজান্ডার ক্যাম্পবেলের নামটা তন্নতন্ন করে খুঁজে কোথাও পেল না ওরা দু'জন।

অনুজা নিজের মনে বলল, 'আশ্চর্য! বাবা এটা চেক করে নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। অস্কার, ড্যানিয়েল, চার্লি কেউ ভেরিফাই করলেন না?'

"হয়তো জেঠুর মতো ওঁরাও সরল বিশ্বাস করেছেন। আর যাঁরা আগেই বুঝতে পেরেছেন, তাঁরা আর মেম্বারই হননি। তাই চার বছরে এত কম মেম্বার। আর-একবার দ্যাখ, আলেকজান্ডার কোনও উত্তর দিলেন কি না। যে-কোনও সময়েই উনি উত্তর দিতে পারেন।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্লগটায় আর-একবার লগ ইন করল অনুজা এবং চরম অবাক হয়ে গেল অর্ণবের ফোটোর তলায় আলেকজান্ডারের কমেন্ট। মাত্র ছ' মিনিট আগে করেছেন কমেন্টটা। 'ফোটোটার জন্য তোমাকে অভিনন্দন অপনেশ। নামচেবাজারে পৌঁছে চিন্তা হচ্ছিল, কোথায় তোমাকে খুঁজব। হোটেলটা চিনিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। শুধু তোমাকে পরামর্শ দেব, রাতের বেলায় চাঁদের আলোয় পাহাড় দেখতে বেরিও না। পিছন থেকে ভুল করে কারও সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেলে যে খাদে পড়বে, সেখান থেকে তোমার আত্মাটা এভারেস্টের চেয়ে অনেক উঁচুতে চলে যাবে।

অনুজা খাট থেকে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "এবার বাবাকে পরিষ্কার থ্রেট করেছেন। হুমকি! বাবাকে এক্ষুনি ফোন করে সাবধান করে দিই।"

অপনেশবাবুকে ফোনে ধরতে পারল না অনুজা। উত্তেজনায় ভুলেই গিয়েছিল যে, অপনেশবাবু মোবাইলটা অফ করে রাখছেন এখন। শেরবাহাদুরকেও মোবাইলে ধরতে না পেরে গায়ের উপর জ্যাকেটটা চাপিয়ে নিয়ে বলল, "চল টুবলু, কিছু একটা খারাপ হয়ে যাওয়ার আগে বাবাকে ডেকে নিয়ে আসি।"

"কিন্তু কোন দিকে যাব অনুজাদিদি?"

"এখানে যেখানে হিমালয়ের সবচেয়ে ভাল ভিউ পাওয়া যাবে। রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে।"

হোটেল থেকে বেরিয়ে দিশেহারা লাগল অনুজা আর টুবলুর। হোটেলের রিসেপশনের ছেলেটা থেকে শুরু করে রাস্তায় এক-একজন এক-একরকম জায়গার দিক বলছে। তার মধ্যে রাস্তা যথেষ্ট নিঝুম হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যেই একসময় অনুজার জ্যাকেটের হাতাটা ধরে টানল টুবলু। চাপা গলায় বলল, "অনুজাদিদি, ওদিকে দ্যাখো।"

একটা ছেলের পিছন দিক দেখা যাচ্ছে। জ্যাকেটের উপর লেখা 'ই ফর এভারেস্ট'। ছেলেটাকে চিনতে পারল, প্রেম। অনুজা গলা ছেড়ে ডাকল, "প্রেম!"

প্রেম চমকে উঠল। চকিতে একবার মুখ ঘুরিয়ে

অনুজাদের দেখেই দৌড়তে লাগল। অনুজা আর টুবলুও দৌড়তে লাগল ওকে লক্ষ করে। কিন্তু প্রেম স্থানীয় ছেলে। পাহাড়ি রাস্তায় দৌড়ে ওকে ধরা সহজ নয়। অচিরেই প্রেম ওদের দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেল। খুব হতাশ হয়ে অনুজা আর টুবলু বসে পড়ল একটা বোল্ডারের উপর। আর তখনই দেখল, অপনেশবাবু শেরবাহাদুরের সঙ্গে এগিয়ে আসছেন সামনের রাস্তাটা দিয়ে।

কাছে এসে অনুজাদের বোল্ডারের উপর বসে থাকতে দেখে অপনেশবাবু খুব অবাক হলেন। অনুজা আর টুবলু উত্তেজিত হয়ে আলেকজান্ডারের কথা শুরু করতেই অপনেশবাবু ওদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আজ আর আলেকজান্ডারের কথা নয়। আলেকজান্ডারের সঙ্গে কাল টক্কর নেব। চাঁদের আলোয় বরফমোড়া এভারেস্ট দেখে এলাম, বুঝলি। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি। শেরবাহাদুর আমাকে যা দেখিয়ে নিয়ে এল, এটা আমার সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা। আমি এই অনুভূতিটা আলেকজান্ডারের কথা শুনে কিছুতেই নষ্ট করতে চাই না।"

"কিন্তু বাবা, ওঁরা আমাদের হোটেলটা চিনে নিয়েছেন। ব্লগে তোমাকে ভয় দেখিয়েছেন।"

"লোকটা নিজেকে খুব চালাক মনে করে। সত্যি কতটা চালাক, কাল তার প্রমাণ পাব। নিশ্চিন্ত থাক, ম্যালোরির ক্যামেরাটা কিছুতেই পাবেন না। আর আমাদেরও কোনও ক্ষতি করতে পারবেন না।"

॥ ১১ ॥

বেশ সকালে ঘুম ভাঙল টুবলুর। টুবলুদের হোটেলটা বাজারের দিকে মুখ করে হলেও টুবলুর ঘরের জানলাটা পিছন দিকে। হিমালয়ের দুর্দান্ত ভিউ পাওয়া যায়। একদম সকালে যদিও তার অনেকটাই মেঘে ঢেকে আছে, তবু সেই মেঘে ঢাকা প্রকৃতিই যেন অনন্য। শান্ত, পবিত্র ভাবটায় মনটা একেবারে ভাল হয়ে যায়। তবে এর মধ্যেই টুবলুর মনে পড়ে গেল, আজ অনেক কাজ। আলেকজান্ডারের সঙ্গে পাল্লা দিতে কাজটা যত দূর সম্ভব তাড়াতাড়ি শুরু করতে হবে। টুবলু দ্রুত রেডি হয়ে ডাইনিং হলে চলে এল। কয়েকজন বিদেশি সেখানে ব্রেকফাস্ট করছে। এখন এমন হয়েছে বিদেশি দেখলেই তাদের আলেকজান্ডার, চার্লি, হ্যারি আর ভারতীয়দের দেখলে মনে হচ্ছে রমেশ, উমেশ।

কোনার দিক বেছে একটা টেবিলে বসল টুবলু। একটু পরেই অপনেশবাবু আর অনুজাও চলে এল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ওঁরাও একদম রেডি। টেবিলে বসার পর অপনেশবাবু বললেন, "আমি একটা ডিসিশন নিয়েছি। যদি আজকের মধ্যে ক্যামেরাটা খুঁজে না পাই, এবার ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে হবে। অনন্তকাল তো এখানে থাকা যাবে না। তবে আমরা না পেয়ে ক্যামেরাটা যদি আলেকজান্ডার নিজের কুটিল উদ্দেশ্যে পান, সারাজীবন আমার আফশোস থেকে যাবে। শুধু যাওয়ার আগে একদিন শেরবাহাদুরের গ্রামে গিয়ে ওর বাড়িতে থেকে আসব। ওকে কথা দিয়েছি। আর ওর গ্রাম থেকে এভারেস্টের ভিউয়েরও যা বর্ণনা দিয়েছে, একবার যাওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না।"

অনুজা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "বাবা জানো, আলেকজান্ডার লোকটা জাল। আলেকজান্ডার ক্যাম্পবেল বলে কোনও লোক এভারেস্টে ওঠেননি।"

অপনেশবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে অনুজার দিকে তাকিয়ে বললেন, "জানি!"

"তুমি জানতে?" অনুজা হতবাক হয়ে বলে উঠল।

"হ্যাঁ জানতাম। লোকটার ব্লগ পড়ে অবিশ্বাস করিনি। কিন্তু যখন ম্যালোরির ক্যামেরাটা পাওয়ার ব্যাপারে ওঁর অধিমা চেষ্টা দেখলাম, তখনই খোঁজখবর করে জানতে পারলাম লোকটা জাল। কিন্তু কলকাতায় সেটা বলিনি। কারণ, তা হলে তোর মা আর আসার পারমিশনটা দিত না। আর তোরাও টেনশন করতিস। আলেকজান্ডার ক্যাম্পবেল নামটা জাল, কিন্তু ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে ওই নামটার পিছনে একটা জ্যান্ত মানুষ লুকিয়ে আছেন। তিনি এই অঞ্চলটার আঁতিপাঁতি চেনেন আর আমি নিশ্চিত, সেই লোকটা ম্যালোরির ক্যামেরাটার সন্ধানে এখন এখানে আছেন। আমাদের দেখা হবেই।"

টুবুলু যোগ করল, "লোকটা শুধু জাল নয়, ডেঞ্জারাসও। ব্লগে আপনাকে রীতিমতো ভয় দেখিয়েছেন।"

"ওসব ভয় দেখিয়ে আমাকে কিছু হবে না। কোর্টে ক্রিমিনালদের বিরুদ্ধে যখন লড়ি, ওরকম ভয় অনেকে দেখায়। ক্রিমিনাল ল' ইয়াররা কখনও ভয় পান না। তা ছাড়া শেরবাহাদুর আমার সঙ্গে আছে। আর তুইও তো আছিস।"

"আজ তা হলে আমাদের প্ল্যান কোথা থেকে শুরু?"

"গরম-গরম পরোটা থেকে। মনে হচ্ছে, তোরা দিদি আর ভাই মিলে অনেক খোঁজখবর করেছিস। সব বল তো। সব ইনফরমেশন এক জায়গায় থাকলে আজকের

বাকি প্ল্যানটা করতে সুবিধে হবে।”

ইতিমধ্যে শেরবাহাদুরও চলে এসেছিল। ব্রেকফাস্ট করতে-করতে অপনেশবাবুর না জানা সব কিছু অনুজা আর টুবলু বিশদে বলল। অপনেশবাবু থমথমে মুখে খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। শুধু রামশপথের ফোটোর কথাটা শুনে প্রাণ খুলে হাসলেন। তারপর আর-এক দফা চায়ের অর্ডার দিয়ে বললেন, “ওয়ান্ডারফুল!”

অনুজা বলল, “আজ সকাল থেকে ব্লগটায় নজর রাখছি। আলেকজান্ডার কিন্তু একদম চুপ করে আছেন।”

“যাঃ! ভয় দেখিয়ে শেষে চুপ করে গেলেন। তোদের তা হলে একটা ওকালতি বুদ্ধি বলি। যখন আমরা ক্রস এগজামিন করি, কাঠগড়ায় কেউ চুপ করে গেলে আমরা কী করি জানিস?”

“কী?”

“উসকে দিই। তাতিয়ে দিই। এমন কিছু বলি, যাতে সে রিঅ্যাক্ট করতে বাধ্য হয়। সেরকম কিছু করা দরকার।”

“কী করা যায়?”

“ব্লগে এমন কিছু লেখ, যাতে আলেকজান্ডার রেগেমেগে রিঅ্যাক্ট করতে বাধ্য হন। আমার ধারণা উনি চুপচাপ থাকলেও, যেহেতু উনি আমাদের ছোটেল পর্যন্ত চিনে নিয়েছেন, আমাদের কিন্তু ফলো করে যাচ্ছেন। আর তোদের মতো উনি নিজেও ব্লগটা নজরে রাখছেন, দেখছেন, আমরা মানে আমি কিছু লিখছি কিনা।”

অনুজা মাথা চুলকে বলল, “কী লেখা যায়? লোকটা তো জেনেই গিয়েছেন আমরা এখানে আছি। অ্যাই টুবলু লেখ তো, ওহে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, ভয় দেখিয়ে কি নিজেই ভয় পেয়ে ইঁদুরের গর্তে লুকিয়ে পড়লি?”

অপনেশবাবু মাথা নাড়লেন, “এসব ছেলেমানুষ উসকানিতে হবে না। দেখলি না, লিখেছেন আমিও পোড় খাওয়া মানুষ।”

“তা হলে কী লেখা যায়?” অনুজা আর টুবলু দু’জনেই ভাবতে থাকল। এমন সময় অপনেশবাবু বলে উঠলেন, “তোরা কি একজনের কথা ভুলে যাচ্ছিস?”

“কে?” সমস্বরে বলে উঠল দু’জন।

“অর্ণব!”

“দাদাই! তার মানে তো আবার একটা সর্বনাশ।”

অপনেশবাবু চোখ পাকালেন, “বড় দাদাকে ওভাবে বলতে নেই। দ্যাখ না ওকে বলে।”

অনুজা অল্প লাজুক হেসে বলল, “আমি বলছি,” তারপর “এখানে সিগন্যাল স্ট্রেন্থটা কম,” বলে মোবাইলটা নিয়ে চলে গেল ঘরের বাইরে।

দশ মিনিটের মধ্যে আই প্যাডটা নিয়ে এসে অনুজা দেখিয়ে বলল, “দ্যাখো বাবা, কাঁচা ঘুম থেকে উঠে আমার কথা শুনতে-শুনতেই অর্ণব কী লিখে দিল।”

অপনেশবাবু মুচকি হেসে বললেন, “জোরে-জোরে পড় তো টুবলু।”

টুবলু আই প্যাডটা নিয়ে পড়তে থাকল, “হাই অস্কার, ড্যানিয়েল, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমাদের মডারেটর আলেকজান্ডারের বয়স হয়েছেন। বুড়ো সিংহ এখন। হালুম-হালুম করে আমাকে চ্যালেঞ্জ করছেন, আবার ভয়ও দেখাচ্ছেন। আমার মনে হয়, আমরা এই ব্লগে আমাদের সময় নষ্ট করছি। আমি শিগগিরই একটা নতুন ওয়েবসাইট খুলছি। তোমরা সবাই জানো, পর্বতারোহণের বিরাট একটা রহস্য আমি উন্মোচন করতে চলেছি। ক্যামেরাটা আমি পেয়ে গিয়েছি। শুধু ম্যালোরির ক্যামেরা নয়, সেই সঙ্গে হিউ এন সাঙের একটা গুপ্ত নথি আমি পেয়েছি, তাতে প্রমাণ আছে অনেক সাধুবাবা এই সব পাহাড়ের চূড়ায় অনেক আগেই উঠেছিলেন, বড়-বড় ইয়েতি দেখেছিলেন...।”

এইটুকু আই প্যাডে পড়ে টুবলু বলল, “সত্যি, দাদাই কী থামতে জানে না? আর যেরকম প্রতিভাধর। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে পাঁচ মিনিটে এইসব লিখে ফেলল!”

অনুজা অর্ণবের পক্ষ নিল, “এবার কিন্তু তোর দাদাইকে দোষ দিতে পারবি না। আমরাই লিখতে বলেছি।”

“কিন্তু এতে কী লাভ হল?”

অপনেশবাবু বললেন, “লাভ একটাই হল। আলেকজান্ডার এত দূর এসে পৌঁছে গিয়েও আমাকে কতটা সিরিয়াসলি নেবেন, সেটা ভাববেন। এটা করে অর্ণব আগে যে রামশপথের ফোটো দিয়ে ভুলভাল পোস্ট করেছে, সেগুলো ও কভার করে গেল। চার্লি, হ্যারি, উমেশ, রমেশরাও ভাববেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ম্যালোরির ক্যামেরা, এসবই বাজে কথা। আলেকজান্ডারকে ওঁরা প্রশ্ন করবেন আমার কথার পিছনে ছোটার কতটা যুক্তি আছে। হয়তো রেগেমেগে ধৈর্য হারিয়ে আমাদের সামনাসামনিও হয়ে যেতে পারেন। সেটা না হলেও নিশ্চিত থাক, আলেকজান্ডারের দলবলের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবেই। কারণ, এইটুকু জায়গায় একই জিনিসের খোঁজে ওঁদের সঙ্গে ঠোক্কর না খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তার আগে আমরা আমাদের অনুসন্ধান কিন্তু দ্রুত শেষ করে ফেলব।”

অনুজা চিন্তিত মুখে বলল, "সেটাই তো এবার কীভাবে করব, বুঝতে পারছি না।"

"কেন? তোরা দুই দিদি-ভাই তোদের মতো যেরকম ভেবে রেখেছিস। দ্যাখ, বেসিক্যালি সম্ভাবনা দু'টো এবং দু'টো সম্ভাবনার মধ্যে কোনও মিল নেই। এক নম্বর সম্ভাবনা, এক শেরপার একটা দোকান ছিল। যে অন্য জিনিসের মধ্যে পাহাড় থেকে কুড়িয়ে আনা জিনিসও বিক্রি করত। স্লাইডে হয়তো ওর দোকানেরই ফোটো ছিল। শেরপার বয়স হওয়ায় দোকানটা বন্ধ করে দিয়েছে। না বিক্রি হওয়া জিনিসগুলো বাড়িতে পড়ে আছে। তার মধ্যে ক্যামেরাটা থাকতেও পারে, না-ও পারে। দ্বিতীয় সম্ভাবনা, ক্যামেরাটা আমাদের খুঁজে পাওয়া দোকানে ছিল এবং সেখান থেকে সত্যি চুরি হয়ে গিয়ে চোরাই জিনিসের ঠেকে আছে। তোরা এক নম্বর সম্ভাবনাটা দেখবি। প্রেমের দোকান থেকে ও তোদের যে বৃদ্ধ শেরপার কাছে নিয়ে যাবে বলেছে, সেখানে যাবি। আমি দু' নম্বর সম্ভাবনাটা দেখব।"

॥ ১২ ॥

পরিকল্পনামতো দু' দলেই ভাগ হয়ে বেরোলেন অপনেশবাবুরা। প্রথমে অনুজা আর টুবলু এবং কিছুক্ষণ পরে অপনেশবাবু আর শেরবাহাদুর। অনুজারা প্রথমেই এল প্রেমের দোকানে এবং যা আশঙ্কা করছিল, ঠিক তাই দেখতে পেল। আশপাশের দোকানগুলো খুলে গেলেও প্রেমের দোকানটা খোলেনি। প্রেমের দোকানের পাশের দোকানে খোঁজ নিয়েও জানতে পারল না, প্রেম কখন দোকান খুলবে।

অনুজা বলল, "হতাশ হলে হবে না বুঝলি। প্রেম অন্তত অসাবধানে আমাদের একটা তথ্য দিয়ে গিয়েছে। সেই বৃদ্ধ শেরপার কথা, যে পাহাড় থেকে জিনিস কুড়িয়ে এনে জমায়। এখন আমাদের সেই শেরপাকে খুঁজে বের করতে হবে।"

অনেকক্ষণ খোঁজ করেও এরকম কোনও শেরপার খোঁজ পাওয়া গেল না। অপনেশবাবুর ফোনও বন্ধ। শেরবাহাদুরকে ফোন করে জানতে পারল, ওদিকেও সেরকম কিছু এগোয়নি। খানিকটা হতোদ্যম হয়ে অনুজা আর টুবলু একটা চায়ের দোকানে এসে বসল। চায়ের দোকানটায় জনাতিনেক বিদেশি টুরিস্ট বসে আছে। অনুজা হঠাৎ ওদের দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল।

টুবলু বলল, "আমাদের এক আজব অবস্থা হয়েছে, তাই না অনুজাদিদি? বিদেশিদের দেখলেই ওই চার্লি, হ্যারি বলে সন্দেহ হচ্ছে। আর আমাদের দেশের লোক হলেই রমেশ আর উমেশ।"

অনুজা টুবলুর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে চাপা গলায় বলল, "ওই বিদেশিদের একজনের হাতে কী দেখেছিস?"

টুবলু মুখ ফিরিয়ে দেখল। সবসুদ্ধ তিনজন। দু'জন পুরুষ, একজন মহিলা। খুব রিল্যাক্সড হয়ে চা খাচ্ছে। তাদের মধ্যে দু'জন নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। তৃতীয়জন একটা লিফলেট হাতে নিয়ে পড়ছে। এই দলটার মধ্যে কী সূত্র অনুজা খুঁজে পেল, বুঝে পেল না। টুবলু চোখের ইশারায় ব্যাপারটা জানতে চাইল।

"লিফলেটটা!" অনুজা একইরকম রুদ্ধশ্বাসে বলল, "ভাল করে লিফলেটটা খেয়াল করে দ্যাখ।"

প্রথমত ,এতটা দূর থেকে লিফলেটটা পড়া দুষ্কর, তার উপর এভাবে অন্যের হাতের লিফলেট পড়া অশোভনও। কিন্তু অনুজা যেভাবে চেয়ে আছে, টুবলুও দূর থেকে পড়ে দেখার চেষ্টা করল লিফলেটটা। এত দূর থেকে ঠিকমতো পড়া যাচ্ছে না সবজে রঙের লিফলেটটা। কিন্তু বড় অক্ষরে হেডিংটা বোঝা যাচ্ছে এবং সেটাই চমকে ওঠার জন্য যথেষ্ট। এভারেস্টের চূড়া নিয়ে পুরো হিমালয়ের রেঞ্জটার একটা ফোটো। তার তলায় বড় অক্ষরে লেখা, সেভ দ্য মাউন্টেন্স ফ্রম ম্যানকাইন্ড। আলেকজান্ডার ক্যাম্পবেলের ওয়েবসাইট আর ব্লগটার টাইটেল।

"তা হলে কি ওঁরাই?" প্রায় দমবন্ধ করে টুবলু জিজ্ঞেস করল।

নিচু গলায় অনুজা বলল, "কিন্তু ওঁদের দলে তো কোনও মহিলা ছিলেন না।"

"তবু এখন ওঁদের উপর নজর রাখতে হবে।"

অনুজা ইশারায় মাথা ঝাঁকাল। কিন্তু বিদেশি তিনজনের যেন কোনও তাড়া নেই। নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। যার হাতে লিফলেটটা ছিল, সে টেবিলের উপর লিফলেট আর চায়ের কাপ রেখে আবার গল্পে মত্ত হল। অনুজা আর টুবলু ভিতরে-ভিতরে ছটফট করতে থাকল। প্রায় আধঘণ্টা পর ওরা উঠে যেতেই চায়ের দোকানের একটা নেপালি কিশোর টেবিলটা পরিষ্কার করতে যেতেই টুবলু দৌড়ে গিয়ে প্রায় ছোঁ মেরে লিফলেটটা তুলে এনে অনুজাকে দিল। অনুজা দ্রুত একবার লিফলেটটার উপর চোখ বুলিয়ে টুবলুকে বলল, "শিগগিরই যা, ওদের গিয়ে জিজ্ঞেস কর লিফলেটটা কোথায় পেল ওরা।"

চা খেয়ে দাম মিটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ওরা। টুবলু দেখতে পেল বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে ওরা। প্রায় দৌড়ে ওদের কাছে গিয়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "এক্সকিউজ মি!"

বিদেশিরা দাঁড়িয়ে পড়ল। একজন নরম মুখ করে বলল, "ইয়েস?"

টুবলু কোনও সময় নষ্ট না করে সরাসরি প্রসঙ্গটায় এল, "দ্য লিফলেট...।" টুবলু দম নিয়ে গুছিয়ে বলে জানার চেষ্টা করল, ওই লিফলেটটা ওরা কোথায় পেল? প্রথম চোটে বিদেশিরা বুঝতেই পারছিল না টুবলু কোন লিফলেটটার কথা বলছে। তারপর বুঝতে পেরে বলল, "ওটা একটা নেপালি ছেলে আজ বিলি করছিল।" খবরটুকু জেনে টুবলু আবার দৌড়ে ফিরে এল অনুজার কাছে। অনুজা লিফলেটটা হাতে নিয়ে হতভম্বের মতো বসে আছে। টুবলু অনুজার হাত থেকে লিফলেটটা নিল। খুব মন দিয়ে পড়ল। লিফলেটটায় আলেকজান্ডার ক্যাম্পবেল একটা আবেদন লিখেছেন। ভাষাটা হুবহু ব্লগ থেকে নেওয়া। সেই পুরনো আবেদন। হিমালয়কে কলুষিত করবেন না। গোটা লেখাটা আর খুঁটিয়ে পড়ল না টুবলু। কারণ, এর প্রতিটা শব্দই তো পড়া আছে। শুধু আবেদনটা নিয়ে এসে আবেদনকারীদের নামগুলো পড়ল। বেশ কায়দা করে লেখা আছে নামগুলো। নামের প্রথম অক্ষরটা বড় ফন্টে, বাকি অক্ষরগুলো আর-একটু ছোট-বড় ফন্টে। পুরো নামগুলোর বিন্যাসটা যেন একটা টানা পর্বতমালা আর বড়-বড় অক্ষরগুলো সেই পর্বতের চূড়া। টুবলু নামগুলোর উপর চোখ বোলাল। আলেকজান্ডার, চার্লি, হ্যারি, অস্কার, ওয়াটসন, ড্যানিয়েল, হিতাচি, উমেশ, রমেশ আর ইয়েলেতসিন। কিন্তু অপনেশবাবুর নামটা কোথাও নেই।

"জেঠুর নামটা ওরা দেননি, দেখেছ?"

"লিফলেটের উলটো পিঠটা দ্যাখ।"

লিফলেটটা উলটে দেখল টুবলু। টাইপ করা লেখাটার কিছুই মাথামুন্ডু বুঝতে পারল না। কীরকম যেন আইনি ভাষা মনে হচ্ছে। গোটা পাতাটা আবার লাল ফেল্ট পেন দিয়ে ক্রস করে কাটা। টুবলু কিছুই বুঝতে না পেরে অনুজার মুখের দিকে চেয়ে রইল। অনুজা খানিকক্ষণ নিজের মনে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "এই লিফলেটটা বাবাই করিয়েছেন। আমাদের শুধু বুঝতে এত সময় লেগে গেল।"

"জেঠু? জেঠু এখানে কোথা থেকে লিফলেট করাবেন এত অল্প সময়ে? আর তা হলে তো আমাদের বলতেন।"

"এখানে করায়নি। বাবার বাজে কাগজের উলটো দিকের সাদা পিঠটায় লিফলেটগুলো প্রিন্ট করে নতুন পাতার ব্যবহার বাঁচিয়েছেন। সব কলকাতা থেকে করিয়ে নিয়ে এসেছেন।"

"কলকাতা থেকে?" আরও অবাক হল টুবলু।

"হ্যাঁ, আলেকজান্ডার ক্যাম্পবেল আর কেউ নন, তোর জেঠু নিজেই।"

"মানে?" টুবলু হকচকিয়ে উঠল।

"আলেকজান্ডার ক্যাম্পবেল। অপনেশ চৌধুরী। দু'টো নামের আদ্যক্ষর দ্যাখ একই। এ সি।"

"সেটা তো হতেই পারে। কোইনসিডেন্স।"

"তুই ভাল করে বাকি মেম্বারদের নাম দ্যাখ। সি ফর চার্লি, এইচ ফর হ্যারি, ও ফর অস্কার, ডব্লিউ ফর ওয়াটসন, ডি ফর ড্যানিয়েল, এইচ ফর হিতাচি, ইউ ফর উমেশ, আর ফর রমেশ, সবশেষে ইয়েলেতসিন। সি এইচ ও ডব্লিউ ডি এইচ ইউ আর ওয়াই। চৌধুরী। আলেকজান্ডারের এ-টা প্রথমে নিলেন চৌধুরী। অপনেশ চৌধুরী।"

"কিন্তু জেঠু কেন এত কাণ্ড করলেন?"

অনুজা মুচকি হাসল, "বাবা চিরকাল এরকমই কাণ্ড করতে ভালবাসেন। এবার কেন করেছেন, সেটা আন্দাজ করতে পারছি। কিন্তু কারণটা বাবাকেই জিজ্ঞেস করবি চল।"

"কোথায় পাওয়া যাবে এখন জেঠুকে?"

"এখানে যে জায়গাটা থেকে এভারেস্টের সবচেয়ে ভাল ভিউ পাওয়া যায়, আমি শিওর, বাবাকে ওখানেই পাওয়া যাবে।"

নামচেবাজার থেকে অল্প উঠে গিয়ে একটা জায়গার কথা বলল অনেকে। সেখান থেকে পাখির চোখে যেমন নামচেবাজার গ্রামটা দেখা যায়, সেরকমই দেখা যায় হিমালয়কে। ট্রেকিং করে সেই জায়গাটায় চলে এল অনুজা আর টুবলু। অনুজা একটা জায়গায় থেমে গিয়ে বলল, "এই জায়গাটার সঙ্গে কিসের একটা ভীষণ মিল খুঁজে পাচ্ছি বল তো?"

টুবলুও খেয়াল করেছিল বাহাদুরচাচার এনে দেওয়া স্লাইডের প্রথম ফোটোটার। তার মানে...ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল টুবলু। অনুজার হাতটা টেনে ধরে বলল, "ওই দ্যাখো অনুজাদিদি।"

এখন আর আকাশে একটুও মেঘ নেই। ঝকঝক করছে নীল আকাশ। তার মধ্যে দূরে দেখা যাচ্ছে এভারেস্ট। মুগ্ধ হয়ে গেল দু'জন। অনেকক্ষণ চুপ করে সেদিকে চেয়ে থাকার পর টুবলু বলল, "চলো, এবার জেঠুকে খুঁজি।"

অল্প আর-একটু উঠেই অপনেশবাবুকে পেয়ে গেল ওরা। একটা বোল্ডারের উপর বসে তন্ময় হয়ে হিমালয় দেখছেন। পাশে দু'টো ছোট বোল্ডারের উপর বসে আছে শেরবাহাদুর আর প্রেম। অনুজা চুপ করে অপনেশবাবুর কাছে এসে বলল, "তুমি ধরা পড়ে গিয়েছ মিস্টার আলেকজান্ডার ক্যাম্পবেল।"

অপনেশবাবু হাসলেন, "তোদের এত সময় লাগল আলেকজান্ডারকে ধরতে? অর্ণব তো কবেই ধরে ফেলেছিল।"

"কী করে?"

"ব্লগের সব মেম্বারয়ের ভাষা কী করে এক হয় দেখে। তারপর ব্লগ মেম্বারদের নামের ফার্স্ট লেটারগুলো সাজিয়ে।"

"আমরাও তো তাই করেছি। কিন্তু ও আমাদের বলল না কেন?"

"আমিই ওকে বলতে বারণ করেছিলাম, যাতে তোরা এই অ্যাডভেঞ্চারের এক্সাইটমেন্টটা পাস," একটু চুপ করে থেকে অপনেশবাবু আবার বলতে শুরু করলেন, "হিমালয় নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা, হিমালয় দূষণ নিয়ে আমার চিন্তাভাবনা আমি আলেকজান্ডার ক্যাম্পবেল ছদ্মনামে লিখতে শুরু করেছিলাম। কেউ সেই ব্লগটায় আগ্রহ দেখায়নি। তখন নিজেই আরও ছদ্মনাম নিয়ে পৃথিবীর আরও পাহাড়ের কথা লিখতে থাকলাম। শেরবাহাদুরের স্লাইডে ফোটো দেখার পর এই জায়গাটা আমাকে টানছিল। সুযোগ খুঁজছিলাম, কীভাবে একবার অন্তত এখানে আসা যায়। শেষকালে ব্লগটাকেই কাজে লাগালাম। শেরবাহাদুরকে একমাত্র সব বুঝিয়ে বলেছিলাম। আর লুকলায় আমিও একটা সিম কার্ড কিনে নিয়েছিলাম। আমার ফোনের ইন্টারনেট থেকে আলেকজান্ডার হয়ে মাঝে-মাঝে ব্লগও লিখেছি। তবে আর-একটা কাজও অনেকদিন ধরে করার ইচ্ছে ছিল। এখানকার ট্রেকারদের কাছে কিছু আবেদন রাখার। প্রেম সেই কাজটা করে দিয়েছে।"

শেরবাহাদুর অপরাধী মুখ করে প্রেমের দিকে দেখিয়ে বলল, "আমার গ্রামের ছেলে। এসেই ওকে সব বলেছিলাম। বড় সাহেবের লিফলেট ও বছরভর ওর দোকানে রাখবে বলেছে।"

"তা হলে ফোটোতে ম্যালোরির ক্যামেরাটা?"

"ফোটোটায় আসলে কোনও ক্যামেরাই ছিল না। তোদের যা বুঝিয়েছিলাম, তোরা সেটাই বিশ্বাস করেছিলি। আমার মোবাইলে যেটা দেখিয়েছিলাম, সেটা ইন্টারনেট থেকে পাওয়া একটা ফোটো। তোরা খুঁটিয়ে দেখিসনি। অর্ণব এটাও ধরতে পেরে গিয়েছিল।"

দাদাই যে সবেতেই ফুল মার্কস পেয়ে যাচ্ছে, সেটা আর বাড়তে না দিয়ে টুবলু বলল, "তা হলে ম্যালোরির ক্যামেরাটাও গল্প?"

অপনেশবাবু ধীরে-ধীরে মাথা ঝাঁকালেন, "না, এটা গল্প নয়, সত্যি। সাংবাদিকরা একবার ম্যালোরিকে চেপে ধরেছিল, 'মশাই আপনি কেন এভারেস্টে যেতে চান?' উত্তরে উনি একটা বিখ্যাত উক্তি দিয়েছিলেন, 'বিকজ ইট ইজ দেয়ার।' ম্যালোরি আর আরভিন প্রথম মানুষ হিসেবে এভারেস্টে উঠেছিলেন কি না, তার প্রমাণে মানুষ এখনও অভিযান চালিয়ে ক্যামেরাটা খুঁজে যাচ্ছে। ম্যালোরি আর আরভিন প্রথম মানুষ এভারেস্ট শীর্ষে উঠতে পেরেছিলেন কিংবা পারেননি, তাতে তাঁদের কৃতিত্বের কিছু কম-বেশি হয় না। যে পর্যন্তই ম্যালোরি আর আরভিন উঠে থাকুন না কেন, সেই পর্যন্তই পৃথিবীর প্রথম মানুষ হিসেবে ওঁরা উঠেছিলেন। পরের দলকে মনোবল জুগিয়েছিলেন এভারেস্ট জয় সম্ভব। এভারেস্টের ট্রাজিক হিরো ওঁরা।"

অপনেশবাবুর গলা ভারী হয়ে এসেছিল। দূরে এভারেস্ট যেন ওঁকেই সমর্থন করে যাচ্ছিল। টুবলু নরম গলায় বলল, "আমি আলেকজান্ডার ক্যাম্পবেলের ব্লগের মেম্বার হব। আমার নিজের নামে। ম্যালোরির কথা লিখব। এভারেস্টের দূষণের কথা লিখব।"

অপনেশবাবুর চোখ চকচক করে উঠল, "তোদের মতো ছেলেরা এগিয়ে এলে চার্লি, হ্যারি, ওয়াটসনদের আর দরকার হবে না।"

শেরবাহাদুর কুণ্ঠিত গলায় বলল, "সাহেব, আজ আপনি গরিবের বাড়িতে যাবেন বলেছেন। সিয়াংবোচে যেতে সময় লাগবে। তারপর আরও পাঁচ কিলোমিটার দূরে আমার বাড়ি।"

অপনেশবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "যার শোওয়ার ঘর থেকে এভারেস্ট দেখা যায়, সে আবার গরিব কোথায়? সে তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী।"